শূন্যের অঙ্ক

শ্রীমতী রাণী রায়

শ্রীসুচেতা কৃপালনীর
ভূমিকা সংবলিত

জিজ্ঞাসা
পুস্তকপ্রকাশক ও বিক্রেতা
১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা—২৯

জাতিধর্মনির্বিশেষে

ভারতবর্ষের মেয়েদের হাতে দিলাম,

যাদের সমষ্টিগত জীবনে আমরা

শূন্যের অঙ্ক দেখি

ভূমিকা

শ্রীমতী বাণী রায় কত বড় সাহিত্যিক সে কথা জানাবার ইচ্ছা নিয়ে এই ভূমিকা আমি লিখতে বসিনি। বাংলাসাহিত্য ভাল করেই সে কথা জানে।

'শূন্যের অঙ্ক' বইখানির একটি বিশেষত্ব আছে। বইএর ভেতরের বিশেষত্ব পাঠকের চোখে ধরিয়ে দেওয়াই ভুমিকাকারের কাজ। সেইদিক থেকে দুই-একটি কথা বলা দরকার।

বাংলাভাষায় আজকাল অনেক ছোট গল্প লেখা হচ্ছে। ছোটগল্পই এখন বাংলাসাহিত্যের গর্ব্ব। তবে, প্রায় সব গল্পই আসছে পুরুষ লেখনী থেকে। সামান্য কয়েকটি, যা মেয়েরা লিখছেন, তা-ও পুরুষদের চলাপথে। নারী হিসাবে তাঁদের স্বতন্ত্র কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, সে বোধ দেখা যায়নি। স্বাধীন ভারতে বিরাট একটি জনসংখ্যা নারী। তাঁরা কি চিরকাল মৌন হয়েই থাকবেন?

মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে যেয়ে এবং নোয়াখালির কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, সত্যই আমাদের দেশের মেয়েদের সমষ্টিগত জীবন শূন্যের অঙ্ক। তাদের যে কত অভাব, কত অপূর্ণতা সে বিষয়ে হাতে-কলমে কাজে নামলে তবে পুরোপুরি বোঝা যায়। তাদের জন্যে ভেবে দেখতে, তাদের জন্যে কাজ করতে জীবনের নানাদিকে কর্মী চাই। এই রকম কর্মীদের

আমি বারে বারে ডেকেছি। শ্রীমতী বাণী রায়ের মধ্যে আমরা একজন সাহিত্যের কর্মী পেয়েছি।

গল্পগুলি পড়ে এবং লেখিকার কথাতে বুঝেছি এই বইতে তিনি বাংলার মেয়েদের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখাতে কলম ধরেছেন। কুমারী, বধূ, জননী, শিক্ষয়িত্রী, অফিসার, কেরাণী, রাজনৈতিক কর্মী, সাহিত্যিকা, গৃহকর্ত্রী ইত্যাদি নানারূপে আমাদের দেশের মেয়েদের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন লেখিকা। বুদ্ধির দীপ্তিতে মর্মের কথাটি ফুটিয়েছেন স্পষ্ট করে। নিরাশা ও ব্যর্থতার মধ্যে মূল্যহীন জীবনযাত্রার অসাফল্য দেখিয়েই লেখিকা কিন্তু নিরস্ত হননি। পথও তিনি দেখিয়েছেন ইঙ্গিতে। তাই মনে হয়, এই গল্পগুলি সত্যই নারীজীবনের ভবিষ্যৎগঠনের পক্ষে অপরিহার্য্য সাহিত্যরূপে সৃষ্টি হয়েছে।

মেয়েদের বিষয়ে বিশেষভাবে কোন অন্তর্গূঢ় কথা বলবার ক্ষমতা মেয়েদেরই আছে। সেইখানেই তাদের সুবিধা। সেই সুবিধা এর আগে সুনির্দিষ্টভাবে কোন মহিলা গ্রহণ করে মেয়েদের অভাব পূরণ করতে বেশী উৎসাহ দেখাননি। 'শূন্যের অঙ্ক' তাই আকস্মিক বিস্ময়ের মত আবির্ভূত হ'ল। দেশের মেয়েদের আমি সাগ্রহে তাদের উত্তরাধিকারে আহ্বান করছি।

মৈত্রেয়ী দেবী

সূচীপত্র

পঞ্চকন্যা

না না, আমি পুরাণখ্যাত চিরস্মরণীয় পঞ্চকন্যার কাহিনী লেখবার উদ্দেশ্যে কলম ধরি নি। এ পঞ্চকন্যা আমাদের মধ্যেই বিরাজমানা। ঘরে ঘরে। বালিগঞ্জের ব্যারিষ্টার মিষ্টার জগদীশ রায়ের বিশাল একতলা বাড়ির পাশের ছোট টালির বাংলোখানা আমার। আমি থাকি সেখানে দুটি কুকুর, একটি দারোয়ান এবং পুরাতন আয়াকে নিয়ে। আমার পেশা? সাহিত্য। হ্যাঁ, আজকাল এ দেশেও বিদেশের নজিরে মেয়েরা সাহিত্যকে পেশা ব'লে গ্রহণ করেছে। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

আমার কথা বেশি বলতে ইচ্ছা করছে না। আজ আমার গল্পের নায়িকা আমি নই, জগদীশ রায়ের একমাত্র মেয়ে সুলেখা ও সুলেখার চার বান্ধবী। মিষ্টার রায় এবং আমার বাংলোর মাঝখানে একটা প্রাচীর আছে, তার গায়ে কালচে-সবুজ শ্যাওলার আস্তর, তার মাথায় মাধবীলতার গোলাপী শাদা রঙের মেলা। সেই প্রাচীরের গায়ে সুলেখার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রকাণ্ড ঢালু বারান্দা, বেতের আসবাবে সাজানো। সুলেখার পার্লার। গ্রীষ্মকালে, বিশেষত চাঁদিনী রাত্রে, সুলেখা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে বন্ধুদের নিয়ে গল্প

করে। তাদের উচ্চ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই, তাদের কথা আমি বুঝি। ওই প্রাচীরের পাশেই আমারও বসবার পোর্টিকো, লতাজালে ঢাকা। চারপাশে অজস্র পুষ্পিত গাছের বাক্স সাজানো। সেই কুঞ্জবনের আড়ালে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি বসি নিঃশব্দে, হাতে কোন সেলাইয়ের কাজ নিয়ে। প্রবাসী ভ্রাতাদের জন্য নানা উলে জাম্পার বুনি প্রতীক্ষারতা পীনেলোপীর ধৈর্যে। কান থাকে সুলেখা রায়ের বারান্দায়। দোষ মনে করি না। আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী তারা। সুতরাং আমিও বন্ধু।

সুলেখা রায় যেন একটি মহাসাগরের তীর, সেখানে কত যাত্রী আসে, কত জাহাজ নোঙর ফেলে! আবার তারা চ'লে যায়, নূতন দল দেখা দেয়! সে যেন নিজেই ওই ছায়াময় কাননকুন্তলা বাড়িটির সত্তা। কত পাখি বসে, গান গেয়ে যায়! পুরুষদের কথা কিছু বলতে চাই না, কারণ বহুদিন ধ'রে পুরুষ অশ্রান্তভাবে নিজেদের কথা ব'লে ব'লে লাইব্রেরি ভরিয়েছে। তাদের সে ক্ষমতা আছে। মেয়েদের কথাই এখন বলা দরকার। আমি তাই সুলেখার মেয়ে-বন্ধুদের কথাই বলব। যারা তার বিশেষ বন্ধু তাদেরই কথা। তারা চারজন ও সুলেখা রায় আমার এই বক্তব্য কাহিনীর পঞ্চকন্যা।

নীল আকাশের ইন্দ্রনীলের সেটিং-এ শুভ্র মুক্তার ঝালর-বোনা চাঁদ। আধুনিক ক্রচ একটি। রায়-বাংলোর তৃণে মরকত,

বৃক্ষের গোলাপে চুনি। এক পার্শ্বে ছোট পণ্ডের জল মুক্তার দ্যুতির পাশে হীরক-দীপ্তি ধরেছে। মালী মোয়ার বন্ধ ক'রে চ'লে গেছে। অস্থির বাতাস মাধবীর দল ঝরিয়ে ফেলছে। পঞ্চকন্যার পশ্চাৎপটে অসংখ্য সীজনফ্লাওয়ার। আমার বাক্সে-বোনা রজনীগন্ধা আর গোলাপী কার্নেশন সুবাস-বিহ্বল ক'রে তুলেছে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা। সুলেখার বাগানে চাঁদ, আমার পোর্টিকোতে অন্ধকার লতার চাঁদোয়ার তলায়। সেই অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে ব'সে প্রতিটি কথা আমি শুনছি তাদের, হাতে রয়েছে মভ রঙের উল হাতির দাঁতের কাঁটায় গাঁথা। মনে হচ্ছে, নির্লিপ্ত শান্ত ভঙ্গীতে আমি অবসর যাপন করছি নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেলাই হাতে। কিন্তু সেলাই আমার ভান মাত্র, ওদের কথা এমনই চুরি ক'রে শোনা আমার নেশা।

পঞ্চকন্যা অবিবাহিতা। কেন যে, এ কৌতূহল মনে জেগেছে বহুবার! কিছু কিছু কথাও শুনেছি। সম্পূর্ণ কাহিনী আজ উপহার দেব। জানি, আজ এই মদির বাতাসে, দিবা ও রাত্রির এই মিলনের শুভক্ষণে তারা মন খুলবে।

নিত্যকার মত দারোয়ান হাতের কাছে বাদামের সরবৎ ও বিকালের ডাক রেখে গেল। ব্যাঙ্কের শেয়ারে এবার কত ডিভিডেণ্ট পাওয়া যাবে জানবার কৌতূহল নেই এখন। আমার পঞ্চকন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তারা সমবয়স্কা, চব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে।

গৃহের অধিবাসিনী স্নলেখা স্বনামধন্য পিতার আদরিণী কন্যা। বি. এ. পড়া পর্য্যন্ত কলেজে সময় কাটিয়ে অসুস্থ শরীরের অজুহাতে পরীক্ষা দেয় নি। এই নিদারুণ গরমেও বেতের ইজিচেয়ারের হাতল ও তার পায়ের ওপর দিয়ে একখানা সূক্ষ্ম রেশমের নীলাভ চাদর ঢাকা রয়েছে। পীড়া তার বাতব্যাধি। প্রকৃতির জহরতকে ম্লান করে দিয়ে তার দীর্ঘাকার আঙুল-গুলিতে একটির পর একটি হীরা চাঁদের আলোয় জ্ব'লে উঠছে।

স্নলেখার পাশে বেতের সোফায় অর্ধশায়িতা কুমারী মাধবী নন্দী। সুগায়িকা ও কবি। দরিদ্র মাতাপিতার ষষ্ঠ সন্তান।

স্নলেখার অন্য পাশের চেয়ারে কুমারী রমলা বসু, বিদেশী শিক্ষার ছাপ-মারা। অত্যাধুনিক পরিবারের অত্যাধুনিকী কন্যা।

রেলিঙে হেলান দিয়ে ব'সে কুমারী অচলা মজুমদার। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা।

আরও একটু ওপাশে বসেছে কুমারী বকুল সোম। গুণের তালিকা তার দীর্ঘ নয়। কিন্তু নির্মল চাঁদের আলোয় সে যেন ছবি আঁকা রয়েছে। বকুল অপরূপ সুন্দরী।

রমলা বসু হঠাৎ স্বভাবোচিত উচ্চ হাসির সঙ্গে ব'লে উঠল, "আচ্ছা স্নলেখা, আমরা একটা চিরকুমারী সভা খুলি না কেন রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ?"

স্নলেখা ধীরে ধীরে একটু ন'ড়ে ব'সে অভ্যস্ত বক্রহাস্যে

তার অভিজাতসুলভ মার্জিত নীচু সুরে উত্তর দিল, "সভ্য কিন্তু পাব না। নিজেদের নিয়ে মেতে থাকতে হবে।"

অচলা মজুমদার কালো ফ্রেমের চশমার ঝিলিক হেনে যোগ দিল, "রাইটো। আমাদের আর বাইরের সভ্য দিয়ে কি দরকার? আমরা নিজেরা নিজেতেই সম্পূর্ণ। ছেলেবেলার বন্ধুত্ব এতদিন টিকে আছে, সভাও টিকে যাবে।"

বকুল সোম মলিন মুখে বলল, "আচ্ছা, একটা অদ্ভুত কথা কি কখনও তোমাদের মনে হয় না? আমাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন?"

"হচ্ছে না অ্যাটঅল। ঠিক ধরেছ তুমি বকুল। অথচ অন্য মেয়েদের চেয়ে, অর্থাৎ যাদের রোজ রোজ বিয়ে হচ্ছে, তাদের চেয়ে আমরা কিছু মন্দ নয়।"—অচলা মজুমদার সায় দিল।

রমলা বসু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল,—"আহাঃ অচলা, বল না কেন আমরা অনেক ভাল। গুণ আছে আমাদের সকলের। রূপ? হ্যাঁ সবাই বকুল না হ'লেও কেউই শূর্পণখা নই।"

মাধবী নন্দী চাঁদের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল,—"আমার অবস্থা খারাপ হ'লেও তোমাদের সকলের টাকাকড়ি আছে। টাকার অভাবে বিয়ে না হওয়ারও কারণ নেই।"

"আর আমাদের চরিত্র,"—অলস ভঙ্গীতে সুলেখা রায় উঠে বসল,—"হ্যাঁ, chaste as Diana না হলেও আমরা

চরিত্রশালিনী। অন্তত, আমার চরিত্র যে ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অসুখ নিয়ে এত ব্যস্ত যে চরিত্র হারাবার অবকাশ হ'ল না!"

"আমাদের স্বভাব-ব্যবহারও ভাল। কেউ আমাদের নিন্দা করে না। লোকে আমাদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। আমরা হাসিখুশি, আমরা চমৎকার মেয়ে!" বকুল আবার আশ্চর্য হ'ল।

"এদিকে স্বাস্থ্যও আমাদের ভাল। এক সুলেখার সৌখিন অসুখ ছাড়া সকলেই অত্যন্ত সুস্থ। না সুলেখা, I must be frank, তোমার অসুখ মানসিক বিলাস, যেমন ভিয়েনাতে আমার কলেজ-বন্ধু অল্‌গার ছিল।"—রমলা বসু অকারণে রেলিঙের লতানো গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ দ্বিখণ্ড ক'রে ফেলল।

"Oh yes, come on Sulekha, be a sport. স্বীকার কর কাজের অভাবে অসুখ তোমার অকাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।—" নখর-রমণীয় হাতের কররেখা জ্যোৎস্নায় ধ'রে অচলা মজুমদার বলল, "নাঃ, আমার হাতে বিয়ে নেই।"

বকুল সোম ব্যথিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "বিয়ে আমি করতে চাই। মাঝে মাঝে জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগে। আর, তোমরা কেউ বিয়ে-পাগলা না হ'লেও একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ক'রে বস নি। আচ্ছা, আমাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন?"

"অথবা আমরা বিয়ে করছি না কেন?"—সুলেখা সংশোধন করল।

চাঁদের ওপর একখানা হাল্কা মেঘ সৌখিন আঁচলের মত বিছিয়ে গেল। চাঁদের ব্রুচে কোন বিলাসিনীর শাড়ি বিদ্ধ হ'ল যেন। চাঁদের আলোয় সুলেখার বাগানের নুড়ির পথ, লাইলাক ঝোপের তলার মাটি কটকী রূপোর কাজের মত ঝকমক ক'রে উঠল। হাস্নু ও-হানার গন্ধে এসে মিশল সোনায়-গড়া দেশী চাঁপার তুলনাহীন সুবাস। আবার দক্ষিণের ব্যাকুল বাতাস ব'য়ে গেল ঝাউগাছের জালী-কাটা পাতার গুচ্ছে দোলা দিয়ে। প্যান্সি, জিনিয়ার বেডের পাশে লম্বা সবুজ ফড়িং লাফাতে লাগল। পঞ্চকন্যা আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকে একবার মনে মনে বলল, এমন কেন হয়!

ধীরে ধীরে তারা প্রত্যেকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের কথা পরস্পরের কাছে মন খুলে বলতে লাগল। সেই সব কথা আমিও বলব।

রমলা বসু। এই যে চঞ্চলা লাবণ্যময়ী তরুণী, কে জানে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে এর প্রেম-জীবন শেষ হয়ে গেছে। রমলা মণীন্দ্র তালুকদারের বাগ্‌দত্তা ছিল, মণীন্দ্র গেল বিদেশে। ফিরে এল মণীন্দ্র জার্মান নারী সঙ্গে করে। সেই বছরই রমলা বসু সাগর পার হ'ল শিক্ষার উদ্দেশে।

বহু পুরুষের কামনা-কুটিল বাহু রমলা বসুর ক্ষীণ কটি

বেষ্টন করেছে। বহু পুরুষের রুক্ষ অধর তার নরম অধরকে লাঞ্ছনা করেছে। কিন্তু, ওই পর্যন্ত। বিবাহ রমলা করতে পারছে কই? যখন নিরালা রাত্রে নয়নে নিদ্রা আসে না, রমলা ঊর্ধ্বে নেটের মশারির কারুকার্যখচিত চালের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে ব'লে ওঠে, মণি, তোমাকে ভুলতে পারি না কেন?

অচলার ও বালাই নেই। ছেলেবেলা থেকে পরীক্ষার ফল ভাল করবার দুরূহ প্রয়াসে অন্য দিকে মাথা তার যায় নি! একেবারে অধ্যাপিকা হয়ে ব'সে অচলা বিবাহের কথা ভাববার সময় পেল। কিন্তু বাধা দেখল অনেক। সে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে রোজগার করছে, সে সব কটা পাস ক'রে কলেজে পড়ায়। সুতরাং অভিভাবকেরা তাকে তাঁদের তথাকথিত সুকুমারমতি তরুণবয়স্ক স্নেহাস্পদ, যাঁরা সাতঘাটের জল খেয়ে চল্লিশ বছরেও কুমার নাম ঘুচোয় নি, তাদের অনুপযুক্তা মনে করেন। অচলার প্রকৃত বয়স ছাব্বিশ শুনে স্থির করেন আসলে ছত্রিশ।

পাত্রদের মতও তাই। চশমা-চোখো টিচারনী চায় না তারা। তারা চায় অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকা। কর্মভীরু এবং সুবিধাবাদীর দল চায় অচলাকে রোজগারের যন্ত্র হিসাবে, কিন্তু অচলা চায় না তাদের। ক্ষোভের সঙ্গে একদিন অচলা বলেছিল আমি শুনেছি, "জানো, শৈলেন দেব বিয়ে করতে চায় আমাকে? শৈলেন দেব দুবারের বার বি, এ, পাস করেছে। সে বন্ধুদের

ব'লে বেড়াচ্ছে, বিয়ে তো আমি ভাই অচলা মজুমদারকে বিনা কারণে করতে চাচ্ছি না, জমিদারি কিনতে চাচ্ছি।"

বকুলের অবস্থা আরও সঙ্গিন। রূপ দেখে তাকে পুরুষ লুব্ধ পতঙ্গের মত বেষ্টন ক'রে ধরে! বিয়ে খুব কম লোক করতে চায়। তার কারণ বকুল সোম নাচগান জানে না, আধুনিক শিক্ষার অভাবে পুরুষমহলে সে জড়পদার্থ ব'নে যায়। তাকে স্পর্শ ক'রে সুখ আছে, তার সঙ্গে কথায় সুখ কই? ক্ষণভুঞ্জন উৎসবে তার কোমল দেহ বক্ষে নিপীড়ন ক'রে ধর, তার পল্লব-মসৃণ অধরে জ্বালাময় প্রদাহ এনে দাও। কিন্তু বিবাহ? ওই লাজুক কুনো মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কাটানো? অসম্ভব!

বৃদ্ধেরা অবশ্য তরুণীভার্য্যারূপে বকুল সোমকে কামনা করে, কিন্তু বিদ্যুৎবহ্নির মত নিজের রূপকে বকুল বৃদ্ধের উপভোগ-বস্তু ক'রে দিতে চায় না। বিশেষ শ্রেণীর যুবকেরা আসে লুব্ধ হয়ে, বিবাহ-প্রস্তাবও দু-একজন করে। কিন্তু তাদের লম্পট-দৃষ্টি নাকি বকুলের দেহে উষ্ণ সলিল সিঞ্চন করে। দুঃখের জীবন বকুল সোমের।

তারপর সুলেখা। এই রহস্যময়ী ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি নিজের দোষে এবং নিজের ইচ্ছায় আজও কুমারী। দেহে তার রোগ আছে। বিদ্যা বা গুণ বাহুল্য নেই তার। দেখতে সে ভাল নয়। তবু তার যা আছে, বন্ধুদের কারও নেই তা। তার আছে ব্যক্তিত্ব।

কাউকে পছন্দ হয় না সুলেখা রায়ের। পুরুষকে সে খেলার সামগ্রী মনে করে। নেড়ে-চেড়ে দেখে খেলায় অরুচি হ'লে দূরে ফেলে দেয়। কিন্তু দেউল তার খালি থাকে না, নব পূজারী আসে।

পুরুষের ক্ষৌরিত কঠিন গণ্ড তার কথার বাণে কেমন রক্তাভা ধরে, পুরুষের সবল মন তার হাসির ছোঁয়ায় কেমন ক'রে কাঁপে—সেই দেখা, সেই খেলা সুলেখার নেশা। নেশাখোর মেয়ের বিয়ে হওয়া দায়।

এদের মধ্যে মাধবী নন্দী কিছু পরিমাণে স্থৈর্য লাভ করেছে। বিয়ে তার ঠিক হয়ে আছে পাড়ারই ছেলের সঙ্গে। সে ছেলে ভাল চাকরি পেয়ে কিছু টাকা জমাতে পারলেই বিয়ে হবে। তার আগে মাধবী রাজি নয়। অভাবে বর্ধিত হয়ে মাধবীর অভাবকে বড় ভয়। মাধবীর মনের মানুষ তার দ্বারে আসে পায়ে হেঁটে নয়, মোটারে চ'ড়ে। মাধবীর প্রেমে আর মাধবীর আদর্শে মিল হয় নি। তাই দুঃখ মাধবীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। রাত্রে যখন প্রিয়-বাহু-বল্লরী তাকে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে অতি কাছে টেনে নেবে, তখন মলিন শয্যা মেঝেতে বিছিয়ে সূতিকাগ্রস্তা জননীর পাশে শুতে হয়। যখন ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা তাকে আকুল ক'রে তোলে, তখন চাঁদের দিকে চেয়ে গান গাওয়া বা খাতা-পেন্সিলে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করা ভিন্ন মাধবীর আটাশ বছরের জীবনে কিছুই করবার থাকে না।

কবিমন মাধবীর। তার প্রয়োজন একটি প্রেমিককে, যার গৃহে সে গৃহলক্ষ্মী হবে, যার রক্তধারায় সে সন্তান রচনা করবে।

সুলেখার বাগানের ঝাউগাছে একটানা সুরে পাখি গান গেয়ে উঠল। ছোট ছোট মেঘ সেই পাখির ঝাঁকের মতই আকাশ দিয়ে আনাগোনা করতে লাগল। আকাশের পাখি তারা। বাগানের পাখি তাই ডাকছে তাদের নীচে নেমে ধরিত্রীকে শ্যামল ক'রে দিতে। লিলি অব দি ভ্যালির পরাগে হলুদ-কালো প্রজাপতি এসে বসল। পণ্ডের জলে একটা নীল স্ন্যাপড্রাগন ফুল খ'সে প'ড়ে ভাসতে লাগল। চাঁদ আরও মাথার ওপরে উঠেছে।

আমার আয়া এসে জানাল, রাত্রির খাবার দেওয়া হয়েছে। আজকের মত শেষ হ'ল আমার পঞ্চকন্যার কাহিনী। উল-কাঁটা পাশের টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালাম আমি। আমার পোর্টিকোর পল্লব-প্রাচীর পার হয়ে চাঁদের আলো এসেছে। সে আলো আমার কালো চুলে বাঁকা হয়ে পড়ল।

পঞ্চকন্যা সহসা চুপ ক'রে গেল। তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে। ভয় পেয়েছে তারা। চোখ নীচু ক'রে হীরক-শোভিত সরু আঙুল দিয়ে সুলেখা চুল ঠিক করতে লাগল। তার হাতের হীরকখণ্ডগুলো উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে জ্ব'লে উঠল আমাকে যেন সাবধান করতে,—সাবধান। তুমি কি আমাদের কথা শুনেছ?

স্থলেখার আধুনিক সত্তা জানে না৷ বন্ধুত্ব কেবল ব্যবহারিক জগতের নৈকট্যে হয় না, বন্ধুত্ব হয় হৃদয়ে। আমি তাই তাদের বন্ধু। তাই আমার বন্ধুর মন আজ তাদের ব'লে দিতে চায়: হায় আধুনিকী। তোমরা ভুলে যাও তোমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচারশক্তি, আদর্শবাদ! তরল ভাবপ্রবণতা তোমাদের সুখী করবে, মূঢ় ভালবাসা পথ দেখাবে। নির্বিকার নারীত্বে তোমাদের মুক্তি। জনারণ্যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে মনের মানুষকে কি চিনে বার করা যায়? মনের মানুষ চিরদিন মনেই থাকে। সমস্যা তোমাদের জটিল। বিবাহ ও প্রেম এক নয়। সেকালের মন নিয়ে হয়তো অজ্ঞান হবে, কিন্তু অসুখী তো হবে না!

নার্ভস

মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করে উঠল। পা থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত শিহরিত হয়ে সুমিতা জাগল। আহা, কি মধুর জাগরণ!

ছোট ভাইবোন আর ভাইপো-ভাইঝি খেলা করছে ছাদে বল নিয়ে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারে ছোটদের নিয়মিত বৈকালে বেড়াতে নিয়ে যাবার লোক নেই, অথচ একা রাস্তায় না ছাড়বার মত ভদ্রতাটুকু আছে। সুতরাং অভাব বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও ব্যায়ামের। তা পূরণের চেষ্টা হচ্ছে ছোটদের সকালে খোলা ছাদে পাঠিয়ে।

অসহ্য! এক মিনিট এ বাড়ীতে থাকা চলে না। সাত-সকালে তারই মাথার উপরে এই আস্ফালন। সারারাত্রি ঘুম হয় না সুমিতার, ভোরের দিকে যা একটু। তা-ও এইভাবে সমাধিগ্রস্ত হ'ল। ন'টায় হাজিরের খাতায় সইটি কে করবে?

"উঃ, আঃ!" সুমিতা হাত-পা ছড়িয়ে উঠে বসল। ইচ্ছা হচ্ছে ভাই-ভাইপো নির্ব্বিশেষে গলা টিপে ধরে গোলমালের মূলোচ্ছেদ করে দেয়। অথচ এদেরি সে ভালবাসে! সে ভাল-বাসার চিহ্ন এখন কোথাও নেই।

খাট থেকে পা নামাতে হঠাৎ আঁচলে খাটের বাজুর টান

লাগল। এই সব প্রকাণ্ড ধেড়ে আসবাব এইটুকু পায়রার খোপে যে মানায় না সে কথা পেনশনভোগী পিতা ছাড়া সবাই জানে। বড় বাড়ীর ভাড়া গুণবার ক্ষমতা না থাকলে এই মান্ধাতা-আমলের আসবাবগুলি বেচে ফেলা উচিত! 'উচিত, উচিত, একশো বার উচিত!' কথা কয়টি চীৎকার করে বলে ফেলে সুমিতা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হ'ল। আড়চোখে পার্শ্বশায়িতা পিসীর প্রতি চেয়ে মন তার আবার জ্বলে উঠল।

এইটুকু খোপে আবার ভাগীদার! সকাল সাতটা বেজে গেছে, বুড়ী টান হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখ। তার নিজের এখনই ট্রাম-বাস ধরবার জন্য ছুটতে হবে হন্তদন্ত হয়ে, অথচ পিসীর মজা কি? অযথা মাটিতে পা ঘষে, কেসে, চুড়ি বাজিয়ে সুমিতা নিরপরাধা পিসীকে সুখনিদ্রা থেকে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে পিসীর উঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। 'দিই একটা চিমটি!'—হাতখানা বাড়িয়ে টেনে নিয়ে সুমিতা ভাবল, সত্যই কি আমি পাগল হলাম নাকি? বিদ্বেষের সঙ্গে একবার পিসীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে অবশেষে সুমিতা বেরিয়ে পড়ল।

'Hail glorious sun!'—প্রতিদিন সকালে এই কথাটি সুমিতার বলা চাই-ই। কেন যে, সে তা জানে না। কিন্তু, যেন না বলতে পারলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। আবার দরজা খুলেই সোজাসুজি সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ

করবার আগে অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেদিন তত ভাল কাটবে না বিশ্বাস আছে তার। দুঃখের বিষয় দরজা খুলেই আজ মাতার পেয়ারের ঝি সুশীলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বিরক্ত মনটা বিষিয়ে উঠল সুমিতার।

আজ কপালে কি আছে কে জানে? সূর্য্য বন্দনা করবার পূর্ব্বেই দেখা হয়ে গেল শূদ্রাণীর সঙ্গে। হাত- মুখ ধুয়ে সুমিতা চায়ের টেবিলে পৌঁছল। যথারীতি চা পাত্রে ঢেলে রাখা হয়েছে—কার্ত্তিকের হিমেল বাতাসে সে চা শৈত্যময়। কত দিন বলেছে সে বৌদিদেরকে তার চা-টা টি-পটে উনুনের ধারে রেখে দেবার জন্য। কথাটা কানে যায় না শ্রীমতীদের।

চা গরম করা চলে না। সুতরাং ঠাণ্ডাজল চা খেয়ে সুমিতা মুখ খুলল, "এর চেয়ে জল খাওয়াও ভাল। কাল থেকে তাই খাব। এত কষ্ট করে আমার জন্যে চা করতে হবে না কারোর। হাজার বার বলেছি—। নাঃ, চা খাওয়া ছাড়ব কেন? নিজে রোজগার না করলে যখন এক দিনও চলবে না, তখন রোজ-গারের রসদ চাই। চা, চিনি, জমানো দুধ নিজেই এনে রাখব—"

মা একটু অপ্রতিভ হলেন,—"ও বৌমা, আর এক কাপ চা করে দাও না সুমিকে। সত্যিই ত এখনই সারাদিনের মত চলে যাবে।"

মেজবৌদি ততোধিক অপ্রতিভ হয়ে চা করতে গেলেন। উনুন বন্ধ ছিল, একটু দেরি হ'ল।

ততক্ষণে সুমিতা নিজের 'খোপে' ফিরে গেছে। চুল খুলে তেল দিতে গিয়ে দেখে তেল নেই। শিশিটা আছড়ে ফেলে দিল সুমিতা—আর সহ্য হয় না। কেন জানি না, আজকাল কিছুই মনে থাকছে না। কাল অফিসে যাবার মুখে বেশ মনে করে গিয়েছিল তার বিশেষ তেলটি কেনবার কথা। ঐ তেল ভিন্ন চুল থাকে না তার মাথায়। কিন্তু পাঁচটার পরের অসম্ভব ভিড়ে-ভর্ত্তি ট্রাম-বাসের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল না যে বাড়ীতে কোনমতে পৌঁছনো ছাড়া অন্য কিছু তার করবার আছে। আজ দু' বছর বি-এ পাস করে সে কাজ করছে, সখে নয়, বাধ্য হয়ে। সংসার সকলের রোজগার দিয়ে কোনমতে চলে।

কবে এ জোয়াল থেকে মুক্তি আসবে? কবে ভিড়ে ঠেলা-ঠেলি করে ট্রামে-বাসে ছুটাছুটির বদলে সে ঘরে বসে চায়ের কাপ হাতে আরামে নভেল পড়তে পারবে বান্ধবী মণির মত। হায় মণিমালিকা, মেয়েদের বিবাহের প্রয়োজন তুমি বুঝতে পার না। জমিদার-দুহিতা তুমি, ইচ্ছামত জীবন যাপন করবার বিলাসিতা পেয়েছ; বোঝ না কেন যেন-তেন-প্রকারেণ বিবাহ সাধারণ মেয়েদের ঈপ্সিত। মণিমালিকা, তোমার কণ্ঠসঙ্গীতে বাংলাদেশ আজ বিমুগ্ধ। নূতন যশের সন্ধানে শীঘ্রই সাগর-পারে যাচ্ছ তুমি। বৈচিত্র্যহীন, অভাবগ্রস্ত জীবন তুমি জানবে কি করে?

কিছুই পারি না কেরাণীগিরি ছাড়া। মাতার নারিকেল তেল মাথায় মাখতে মাখতে সুমিতা দেওয়ালে-টাঙানো আয়নার দিকে তাকাল। এই কি সে? রুক্ষ, কর্কশ মুখভাব, বিবর্ণ চামড়া! সারামুখে অতৃপ্তি, হতাশা মাখানো। এই কি সে সুমিতা দত্ত, যাকে দেখে সুবীর কবিতা লিখত! যাক, ও নাম আর কেন? ক্ষণিক বিষাদভাবটা কেটে গেল দড়াম করে স্নানাগারের দরজা বন্ধের শব্দে। মেজদা ঠিক ঢুকেছে, এখন আধঘণ্টার আগে বাথরূম পাবার উপায় নেই। মেজদার হাজিরে দশটায়, কিন্তু রোজ সুমিতার আগে বাথরূমে যাওয়া চাই। রাগে পাগলের মত সুমিতা দরজায় ঘা দিতে লাগল, "বেরোও শিগগির, বেরিয়ে এস বলছি। আমার দেরি হয়ে যাবে।"

"আঃ, কি বিরক্ত করিস? মেয়ে যেন ঘোড়ায় চড়ে এসেছে!—" মেজদার আত্মপ্রীত কণ্ঠ শোনা গেল। কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার ভিতর-বাহিরে বিতণ্ডার পরে সুমিতা বাথরূমের অধিকার গেল।

ঘরে ফিরে এসে চুল বাঁধতে গিয়ে নিজেরই আছড়েফেলা শিশির কাঁচ ফুটে গেল পায়ে। "উঃ"—সহসা চিন্তামগ্নচিত্ত দৈহিক বেদনায় চমকিত হয়ে উঠল। গায়ের জোরে নিজের পায়ে চপেটাঘাত করে সুমিতা টেনে খুলতে বসল কাঁচের টুকরো। নিজের ওপর করুণায় চোখে জল এসে গেছে তার। আর পারে না সে, আর পারে না প্রতিমুহূর্তে ভাগ্যের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে চলতে।

ঠক্, ঠক্! চমকে আবার শিউরে উঠল সুমিতা। তার ভাইঝি রুণু একটা ছড়ি দিয়ে ক্রমাগত চেয়ারের হাতলে আঘাত করে যাচ্ছে খেলাচ্ছলে। নিজেকে সংবরণ করতে পারল না সুমিতা। প্রতিটি শব্দ তার মস্তিষ্কের কোষে আঘাত করে স্নায়ুমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। রুণু কচি গালে পিসীর পাঁচ আঙুলের ছাপ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করতে গেল মায়ের কাছে। পরক্ষণেই কলহপ্রিয়া বড়বৌদির বায়স কণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "বাচ্চা মেয়েটাকে মেরে রাগ দেখানো কেন? আঙুলে দাগ কেটে বসেছে দেখ! এমনই করেই মারতে হয়!—"

কি ছোটলোক বউটা! নিজে ছেলে-মেয়েদের ঠেঙাতে ঠেঙাতে আধমরা করে ফেলে, কিন্তু অন্য কেউ কিছু বললেই কোমর বেঁধে তারস্বরে চেঁচায়। হায় ভগবান, এ তো গৃহ নয়, নরক। অসহায় ক্ষোভে সুমিতা ঘুষি পাকিয়ে হাত মুঠো করল। আয়নার পাশে বড়বৌদির হাস্যরত প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে সে হাত খানিকটা উঠেই শিথিল হয়ে গেল। আবার আয়নায় সুমিতা নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছে। ক্রোধে, ঘৃণায় বিকৃত, কদর্য্য মুখ। এ কি সেই সুমিতা দত্ত, সুবীর যার ছবি এঁকেছিল!

দিনের শেষ। চলন্ত ট্রামের দোদুল্যমান লোকগুলির দিকে চেয়ে সুমিতা নিশ্বাস ফেলল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে

যদি একটু স্থান পাওয়া যায়। দাঁড়াতে সে কাতর নয়, উঠতে পারলেই হ'ল। ট্রাম এসে থামবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান জনপ্রবাহ যেন পাগল হয়ে ওঠে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে যারা শান্তশিষ্ট ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ তাদের অশোভন ব্যস্ততা দেখে চমৎকৃত হতে হয়। তৃতীয় ট্রামের পেছনে কিছুক্ষণ ছুটে সুমিতা আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড়াল। তার অফিসের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ষ্টেনো কেমন জল-কেটে-চলা মাছের মত লোকের স্রোত কেটে উঠে পড়ল। উঠতে পারলে না সে-ই। আজ সারাটা দিন লাঞ্চ না খেয়ে কাটল। ভারি লাঞ্চ খায় সে! 'লাঞ্চ' মানে চমৎকার কিছু নয়—টিনের কৌটোয় বাড়ী থেকে বয়ে-আনা দালদায় ভাজা ঠাণ্ডা লুচি-পরোটা, কিছু তরকারি। কোন দিন বাক্স খুলে দেখা যায় শাক-পাতার চচ্চড়িও আছে। দুর্লভ দিনে মাঝে মাঝে ভাল কিছুও থাকে, যেমন পরশুদিন 'মনোহরা' সন্দেশ ছিল। বড়দি শ্বশুরবাড়ী জনাই থেকেই পাঠিয়েছিল। নইলে সুমিতার পক্ষে লাঞ্চ কেবলমাত্র নামেই সুন্দর। আজ বড়বৌদির উপরে রাগ করে খাবারের কৌটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে চলে এসেছে। বাড়ী ফিরলে হয়তো সেই খাবারই খেতে হবে। পেটের মধ্যের নাড়ি বিতৃষ্ণায় মোচড় দিয়ে উঠল। গা বমি-বমি করছে কেন? আশ্চর্য্য, সারাদিন প্রায় উপবাসে কাটিয়েও এমন অরুচির ভাব হয়। অস্থির ভাবে সুমিতা

পায়চারি করে বিতৃষ্ণ ভাবটা দমন করতে চেষ্টা করল। পার্কের গাছের দিকে চেয়ে, এসপ্লানেডের সাজানো দোকান-গুলোর দিকে চেয়ে সুমিতা অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল।

পায়চারি করবার উপায় নেই, লোকের গায়ে গা লেগে যায়! নিরুপায়ভাবে সুমিতা আবার থেমে দাঁড়াল। সহসা একটা উপায়হীন তীব্র ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। তারই মত সব কেরাণীর পাল। ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড ডিনারের নিমন্ত্রণ রয়েছে, যেন সভাপতিত্ব করতে হবে, যেন পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে। এক মিনিট দেরি সয় না, অসম্ভব ভিড় হলেও ঠেলে ঠেলে উঠবেই! যেন ট্রেন ফেল হবে! নরাকার জন্তু সব! এখনই যদি পুলিসের গুলি চলে, এরা যে যেখানে আছে সে সেখানে ধপ করে পড়ে মরে, বেশ হয় বেশ হয়! বেশ হয়! সুমিতা দাঁতে দাঁত পেষণ করল। কেন এরা বেঁচে আছে? কিসের লোভে, কিসের আশায় এরা পৃথিবীতে অপদার্থের দল বাড়িয়ে চলেছে? সহস্র সত্তা হয়ে সুমিতা এদের গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়। সুমিতার অসংখ্য শত্রুর মধ্যে এরা একজন। এদের জন্য সে ট্রামে উঠতে পারে না, আরাম করে ষ্টপেজের কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে না। এদের উৎপাতে সে পায়চারি করে বিব-মিষাকে দমন করতে পারছে না। গাওয়া ঘিতে ভাজা গরম লুচি আর মাংস আজ সে খাবে। যেমন করে হোক খেতেই হবে,

খেতে পারলে নিশ্চয় তার ভাগ্যে একটা ভাল কিছু হবে। আঃ, যেন মুখের মধ্যে মাংসের ঝালের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে, যেন লুচির সুঘ্রাণ নাকে ভেসে আসছে! আজ সে বাড়ী ফিরে গরম লুচি-মাংস খাবেই। নিশ্চয় মা আপত্তি করবেন—'মাংসের যা দাম, বাবাঃ। গাওয়া ঘি-ই বা কোথায়?' আবার মনে মনে সুমিতা জ্বলে উঠে মাকে গালাগালি দিতে লাগল, 'আমার বেলাতেই না। ছেলেরা বললে তো তখনই হয়। কেন আমি কি সংসারে টাকা দিই না? কত লাগবে দিচ্ছি। আমি আজ লুচি-মাংস খাবই।' চমকিত হয়ে সুমিতা দেখল সে হাতব্যাগ খুলে টাকার চামড়ার থলেটা বের করে ফেলেছে। অপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ বন্ধ করে একবার চারপাশে তাকাল সে। কেউ দেখে নি তো? হায়, তার একটু নিভৃত চিন্তার অবকাশও নেই।

এবারের ট্রামে উঠে একটু বসবার স্থান পেল সুমিতা। বিপর্যস্ত বেশভূষা সামলাতে সামলাতে পাশের ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল। কি মোটা! বেঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করে হাত-পা এলিয়ে বসেছে দেখ! নূতন লোক এলে একটু গুছিয়ে বসে যে জায়গা করে দেবে সে জ্ঞান নেই। মহারাণী অব্ ক্যালকাটা! গায়ের সঙ্গে ভদ্রমহিলার স্থূল বাহু ঠেকছে। কি অস্বস্তিকর অনুভূতি! এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেব নাকি? প্রাণপণে সুমিতা আত্মসংবরণ করে বাইরে তাকাল।

বমনেচ্ছা কেটে গেছে, কিন্তু মাথাটা ধরে উঠেছে সাংঘাতিক

ভাবে। হঠাৎ বাঁ-হাতটা থর্‌থর্ কেঁপে উঠল। হাতের দুটো আঙুল অন্য আঙুলের থেকে বিভিন্ন হয়ে টিকটিকির কাটা ল্যাজের মত লাফালাফি করতে লাগল। কি যে হয়েছে সুমিতার!

পেছন থেকে কে যেন তার গায়ে হাত দিল। কি আস্পর্দ্ধা, খুন করে ফেলব। ঘাড় ফিরিয়ে কিন্তু দেখা গেল, বছর দুইয়ের একটি বাচ্চা এক ঝি-শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কোল থেকে তার কাপড় ধরে টানাটানি করছে। স্নেহ হ'ল না, হ'ল বিরক্তি। তার মত একটি ভদ্রমহিলার কাপড় ধরে টানবার অপরাধে ঝি-টার কোন শাসন নেই। আবার এক টান। অতি বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে সুমিতা বলে উঠল, "আঃ!" ফলে খোকার খেলার প্রবৃত্তি প্রশমিত হ'ল।

আবার মোটা মহিলার কনুয়ের খোঁচা লেগে গেল। গা শির্‌শির্ করে উঠল সুমিতার। আর সামলানো যায় না। ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে সুমিতা একটি শক্ত ঠেলা দিল। ভদ্র-মহিলা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

সহসা সুমিতার মন বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল। সারা-দিন অফিসে কেটেছে কত দুঃখে। কত অপমান, কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। নিষিদ্ধ মুখ দেখে সকালে শোবার ঘরের দরজা সে পেরিয়েছে, সূর্য্যকে অভ্যর্থনা করতে পারে নি। এ তো জানা কথা যে আজকের লাঞ্ছনা তার ললাট-লিখন।

পাঞ্জাবী বস্ ঘরে ডেকে নিয়ে চাপাস্বরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করেছে। যে চিঠিখানাই সে লিখবে সেখানেতেই গোটা চারেক ভুল বের করে শ্রীমান্ নিজের মুরুব্বিয়ানা দেখাবেন। 'হ্যাপি' শব্দ কেটে 'গ্লাড্' বসিয়ে, 'অ্যাণ্ড'-এর বদলে 'অল্সো' দিয়ে দেখানো চাই যে তিনি খুব জবরদস্ত ওপরওয়ালা। বিদ্যায় তো বৃহস্পতি, চাল দেখে মনে হয় চার্চ্চিল-হিটলার-ট্রুম্যানের মিশ্রণ। মিশ্র যোগ। সাধারণ ইলেকট্রিক পাখা সংক্রান্ত চিঠি নিয়ে সে কি টাই ধরে টেনে, চুলে হাত বুলিয়ে, পেন্সিল টেবিলে ঠুকে, ছাদের দিকে চোখ তুলে আলোচনা! যেন শেক্স্পীয়রের ট্রাজেডির ব্যাখ্যা হচ্ছে। কেন ওর কিছু হয় না, ঐ থ্যাবড়ানো মুখ, চ্যাপ্টা বাংলা পাঁচের? আজ অবশ্য এ তিরস্কার সুমিতার পাওনা ছিল। কষা অঙ্কের উত্তর মিলে যাওয়ার নিশ্চিন্ততায় সুমিতা চোখ তুলে সামনে তাকাল। সে জানত আজ এ তার পাওনা ছিল।

চোখের পাতা কেঁপে উঠল হঠাৎ। মেয়েদের বাঁ-চোখ নাচা ভাল, তার কপালে নাচল ডান চোখ। ফল শুভ নয়, প্রমাণ—"প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিলা"—। তার ফলে মেঘনাদের মত স্বামীর মাথা খেল প্রমীলা।

কানের কাছে ঝন্ ঝন্ করে মিলিটারি লরি চলে গেল। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে শব্দে। এদিকে গা ঠেসে মুটকী বসেছে দেখ! যেন আমার শরীরটি কুশন-চেয়ার। হাত

জোরে মুষ্টিবদ্ধ করে সুমিতা সংযম অভ্যাস করতে লাগল। যাক্, 'মহারাণী অব্ ক্যালকাটা' এতক্ষণে নেমে গেলেন।

থেকে থেকে চোখ নাচতে লাগল। উঃ, কি খিদে পেয়েছে! সেই ফেলে আসা ঠাণ্ডা পরোটা ও চর্চ্চরি উপকরণের জন্য মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। যাহা পাই তাহা খাই। কিছু পেলেই হবে। ফেলে-আসা খাবারই চাই তার।

বাড়ীর মোড়ে নামল সুমিতা। একটুক্ষণ হাঁটতে হবে। বাড়ী ফিরে দেখা যাবে নিদারুণ দিনের নিশ্চয় কোন নিদারুণ সমাপ্তি প্রতীক্ষা করে আছে নিঃসন্দেহে। ভবিষ্যৎ দুঃখের চিন্তায় সুমিতার গলার কাছে যেন শক্ত একটা পাথর উঠে এল।

আচ্ছা, কি হ'ল তার? কখনও রাগ, কখনও দুঃখ! যে কোন একটা শব্দ কানে গেলে মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ে। কি হ'ল আমার? কি অদ্ভুত লাগছে।

'নার্ভস্!' ঠিক, পিসতুতো ডাক্তারদাদা বলেছেন সুমিতার নার্ভের অবস্থা সঙ্গীন। স্নায়বিক গোলযোগ তা হলে এই হাসিকান্নার কারণ! তাই তো নভেলের নায়িকার মত দুর্ব্বোধ্য ব্যবহার করে যাচ্ছে সে। সত্যি, আধুনিক লেখকেরা তো এই ভাবেই নারী চরিত্র আঁকেন আজকাল, ধরা-ছোঁয়া যায় না। তা হলে সবাই কি নার্ভের ব্যারামে ভুগছে, একটিও

সুস্থ-স্বাভাবিক নায়িকা নেই? কিন্তু লেখকেরা জানেন কি যে তাঁরা রোগগ্রস্তা নায়িকার চিত্র অঙ্কিত করেছেন? যদি তা জানেন তবে 'নেতি-নেতি' ভাব কেন? দৃঢ় তুলির আত্ম-নিশ্চিত টান কোথায়?

আধুনিক লেখকদের মুণ্ডপাত করতে করতে সুমিতা বাড়ী এল। রকের ওপরে যথাক্রমে ছেলেমেয়েরা ফেরিওয়ালাকে ডেকে বেসাতি নামিয়েছে। দারুণ বিরক্তিতে সুমিতা সদর দরজা পার হ'ল। সামনেই মার-খাওয়া রুণু। লাফাচ্ছে দেখ? লজ্জা নেই।—"পিতি, তোমাল তিথি। মন্ত তিথি। তিকিত আমি তাই।"

এ কি? চিঠি! চিঠি! সুবীরের চিঠি। সুবীর তাকে ভোলে নি। রুণুর হাত এড়িয়ে সুমিতা ঘরে এসে চিঠি পড়ল। কায়রো থেকে সুবীর রওনা হয়েছে—ভারতবর্ষে প্রথম মুখ সে দেখতে চায় সুমিতার। আঃ!

খাটের ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়ল সুমিতা। কি সুন্দর এই খাটখানা! বড়বৌদি কি ভাল! বিছানা পেতে রেখেছে।

ঠক্, ঠক্, ঠক্! ছেলেমেয়েরা ছাদে উঠে গেছে। নিয়মিত খেলা করছে তারা। সুমিতা স্নেহের হাসি হাসল—কি সজীব ছেলেমেয়েরা!

শাড়ী

মঞ্জুলেখা আজ বড় ব্যস্ত। অপরাহ্ণে তার বাড়ীতে চা-আসরের আয়োজন হয়েছে, কেবল মহিলারাই আসবেন। পাড়া-প্রতিবেশী, নিজের বান্ধবী, স্বামীর বন্ধুপত্নীও কেউ কেউ আছেন। তিনখানি ঘরের ফ্ল্যাটে বর্ত্তমান অপ্রাচুর্য্যের দিনে প্রায় জন বার লোক বলা হয়েছে। সুতরাং মঞ্জুলেখাকে বিব্রত হতে হয়, যদিও আনন্দ উত্তেজনারও অভাব নেই।

না বললেও চলেনা। বালিগঞ্জের এই নিম্নমধ্যবিত্ত পল্লীর অর্দ্ধশিক্ষিতা পল্লীবাসিনীদের কাছে এটা একটি অপরিহার্য্য সামাজিকতার অঙ্গ। স্বামীরা কেউ বা বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক, কেউ বা ছোটদরের অফিসর, কেউ বা উকীল। ধনীর প্রাচুর্য্য না থাকলেও সৌখিনতার অবকাশ আছে; সময়ও কিছু হাতে থাকে, কারণ প্রতিটি পরিবারেই একটি করে কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ডের সমাবেশ দেখা যায়।

পাশাপাশি ছোট ছোট ফ্ল্যাটগুলি দেখলে তাদের সমষ্টিগত একতায় আশ্চর্য্য হতে হয়। একটি করে বসবার ঘর, তাতে গৃহিণীদের বৈবাহিক যৌতুকের আসবাবপত্রের সঙ্গে দুই-একখানা বেতের চেয়ার, কাঠের ত্রিপদী, ক্যানভাসের ইজিচেয়ার স্বহস্তের কারুকার্য্যখচিত আবরণীতে আবৃত। গৃহিণীরা কেউই চল্লিশোর্দ্ধে

মন, সন্তানও তিন চারটির অধিক নয়, সুতরাং ঘর সাজানোর উৎসাহ এখনও অপরিসীম। চৌরঙ্গীতে যাবার প্রয়োজন নেই —রাস্তার ফিরিওলার একবার তাঁদের দুয়ারে পসরা না নামিয়ে চলে যাবার উপায় থাকেনা। জানালা-দরজায় নীল পর্দ্দা ঝুলছে, তাদের গত জীবন কেটেছে গৃহিণীর অঙ্গের বসনরূপে। কাঁচের আলমারীতে কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুল থেকে আরম্ভ করে কাঁসার ধূপদানী পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য জিনিষ হিসাবে সজ্জিত।

ভাঁড়ার ঘরের একপাশে কাঠের বার্ণিশচটা টেবিল ভেনেস্তাচেয়ার বেষ্টিত অবস্থায় বিরাজমান, ডাল-ভাত-শুক্ত-ঝোলের থালা ওখানেই পড়ে। রান্নাঘরে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আলমারীতে আটপৌরে কাঁচের বাসন, গৃহিণীর কাবার্ড। শোবার ঘরে জোড়াখাট, ড্রেসিংটেবিল, মেঝেতে চিত্রিত মাদুর। এইখানেই প্রত্যহ সুদীর্ঘ দ্বিপ্রহরে তাসের আড্ডা, গল্পগুজবের আসর বসে। আবার স্বামী-সন্তানের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে গৃহিণীরা যে যার ঘরে ফেরেন। তার পরে মাঝে মাঝে চা-পার্টী দিয়ে সামাজিকতার বন্ধন সুদৃঢ় করা হয়।

মঞ্জুলেখার স্বামী প্রবোধ সরকার বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু বেতন তার কম হলেও ক্ষতি নেই; ছাত্র পড়ানো, নোটলেখা, পরীক্ষার খাতা দেখা প্রভৃতিতে ত্রিগুণ আয় হয়। সুতরাং চায়ের পার্টী মঞ্জুলেখা ঘন ঘনই দিতে পারে, শাড়ীর দোকানে যাতায়াতও তার বেশী। সাড়ে চারশো টাকা

মাইনের গভর্ণমেণ্ট অফিসর কুঞ্জ লাহিড়ীর স্ত্রী চারুর থেকে মঞ্জুর স্বচ্ছলতা অধিকতর সন্দেহ নেই।

মঞ্জুর তিনটি সন্তান। দুরন্ত বড় ছেলেটিকে তার মামার বাড়ী এবেলার জন্য পাঠান হয়েছে। দ্বিতীয় সন্তান খুকুমণিকে তার কাকা বউদির অনুরোধে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। এরা দুজনে বাড়ী থাকলে চা-পার্টী মাথায় উঠত। ছোটটির কেবল বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা গেল না, কারণ তার বয়স মাত্র একবছর। ঠিকে ঝিকে কিছু পয়সা কবুল করে খোকাকে তার কোলে দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সে ঠিকে ঝির কাছে ঠিকমত থাকতে চাচ্ছে না। মাঝে মাঝে তার ক্রন্দন ধ্বনিতে মঞ্জুর ছুটে আসতে হচ্ছে। রান্নাঘরে কম্বাইণ্ডহ্যাণ্ড জগমোহন নিমকী ভাজতে ব্যস্ত।

বসবার ঘরের সোফার কুশনগুলো ঝেড়ে ফুলিয়ে দিয়ে মঞ্জু তৃপ্তির দৃষ্টিতে চারিদিক দেখল। না, এ ঘরের নিন্দা কেউ করবে না; এমন কি শীলাও না, যদিও মেম বৌদির কল্যাণে শীলার রুচি বহু পরিমাণে উন্নীত।

এইবার সাজগোছ করবার পূর্ব্বে রান্না ঘরটার তদারক করা যাক। টেবিলের ওপর মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে আনা কেক, পুঁটিরামের সন্দেশ, পাড়ার দোকানের অমৃতী রয়েছে। চিঁড়েভাজার সঙ্গে ডালমুট মিলিয়ে রাখা হয়েছে। এখন নিমকীগুলো ভাজতে পারলেই হবে।

"ওকি জগ, নিমকীগুলো আরও ছোট কর। এত লোক, কুলোনো চাইতো। ঠিক যেমনটি দেখিয়ে দিয়েছি তেমনি করে ভাজ।"

রান্নাঘরে নির্দ্দেশ দিয়ে মঞ্জুলেখা শোবার ঘরে এল। "না খোকন না, এখন কোলে নয়, মণি! জামা কাপড় ছাড়ব না?" সযত্নে তুলে রাখা একটি বড় কাঁচকড়ার পুতুল খোকনের হস্তগত হ'ল, এতদিন যা চেয়ে চেয়েও সে পায় নি।

"ওকে এই ছোট বারান্দাতে খেলা দিয়ে বসিয়ে রাখ, রামের মা। দেখো যেন বসবার ঘরে যেয়ে না পড়ে।"

এইবার প্রসাধন পর্ব্ব। মণিকা দিদি তাঁর ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। সে কলেজের অধ্যাপিকা এবং উগ্র আধুনিকা। সুতরাং তাকে চমক লাগাবার মত সজ্জা করা চাই।

গতমাসে স্বামী বইলেখা বাবদ কিছু থোক টাকা পাওয়াতে একখানি ভাল শাড়ী সে সম্প্রতি কিনেছে। সেইখানি কয়েকবার ব্যবহৃত হলেও আজকের কাজ চালানো যাবে।

জড়িপাড় সবুজ কাপড়খানি আলমারী থেকে বার করে লেসের পাইপিন শোভিত নীলাভ জামাটি মঞ্জুলেখা গায়ে দিল। শাড়ী হাতে আলনার সম্মুখে দাঁড়াতেই কিন্তু মনে তার একটু দ্বিধা এল। এত গাঢ় সবুজ রং দিনের বেলায় কি কটকটে লাগেনা? তার ওপরে নূতন কেনার পরে কাপড় খানা অন্ততঃ তিন চার বার পরা হয়েছে। যাঁরা আজ আসবেন তাঁরা

সকলেই হয়তো কাপড়খানা চিনে ফেলবেন। এর চেয়ে পুরোণো কোন কাপড় পরা সমীচীন। অনেকদিন না দেখলে লোক সে কাপড় সহজে চিনতে পারেনা। আলমারীর সম্মুখে চিন্তিত মুখে মঞ্জুলেখা দাঁড়াল একে একে তার অসংখ্য বস্ত্র উল্টেপাল্টে দেখতে।

পাতলা শাদা কাপড় জড়ানো খানিকটা বেগুনী রং এবং জরির সরু আঁচল। ওঃ! এটাতো একবারও পরা হয় নি—গাঢ় বেগুনী জরিদার শাড়িখানা অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতে এসেছে তার। এখানাই পরা যাক না—বড় ইচ্ছা করছে। এই চমৎকার বেনারসী পরলে তাকে খুবই সুন্দর দেখায় চিরকাল।

শ্বাশুড়ীর শাড়ী, কিছুদিন হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পল্লী-গ্রামবাসিনী ছোটজা সম্প্রতি দেবরের হাতে বড়জাকে কাপড়খানা পাঠিয়ে লিখেছেন, "আপনি বড়দিদি, মাতাঠাকুরাণীর শাড়ীখানি আপনারই পরা উচিত।"

ভাল কথা! বিবাহের পর বছর পাঁচেক পাড়াগাঁতে পড়েছিল মঞ্জুলেখা, প্রবোধের বাসা বাঁধবার অবস্থা হয় নি এখানে। পূজা ইত্যাদি উৎসবের সময়ে মাঙ্গলিক কর্ম্মে শ্বাশুড়ী এই কাপড়খানা পরিধান করতেন। দুই-একবার তারও সৌভাগ্য হয়েছিল পরবার। মনে পড়ে এক বিজয়া দশমীতে এই শাড়ী প্রথম তার অঙ্গে উঠেছিল, প্রতিমা বরণের ভার ছিল তার

ওপরে। চুপিচুপি সপ্তদশী মঞ্জুলেখা নিজের ঘরে বড় আয়নায় নিজের রূপ দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার আবছা আলোতে চুরি করে দেখা সেই নিজের রূপ আজও তার চক্ষে অমর হয়ে জেগে আছে। সোনালী জরির কল্কা সারা দেহে পাড় হয়ে জড়িয়ে আছে, স্নিগ্ধ বেগুনী রং মঞ্জুর কোমল শ্যামশ্রীকে কি দীপ্তিই দিয়েছিল! এই শাড়ীখানির ওপর লোভ ছিল তার সেইদিন থেকেই। এতকালে সেই আকাঙ্খার নিধি হস্তগত হয়েছে।

কিন্তু, এ রংও তো দিনের বেলার পক্ষে বেশী গাঢ়? তবে সেকালের শাড়ীর এই রংই হয়। দেখলেই জিনিষটার কদর সকলে বুঝতে পারবে। এমন একখানা শাড়ী অনেকেরই ঘরে নেই।

আচ্ছা, নিজের বাড়ীতে পরে থাকবার পক্ষে শাড়ীটা বেশী জমকালো নয় কি? মঞ্জুলেখা মনকে প্রবোধ দিল চৌধুরীবাটীর বিগত পার্টীর স্মরণ দিয়ে। ব্যারিষ্টার মন্মথ চৌধুরীর পুত্রের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন তার স্বামী। সেই পুত্রের জন্মতিথি উপলক্ষে তাদের উভয়ের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। বাড়ীর মেয়ে ইরা সেদিন এর চেয়ে অনেক জমকালো নীল রংয়ের জংলাকাজের একখানা বেনারসী পরেছিল। অবশ্য ইরা ধনীর কন্যা, জমিদার বংশের পুত্রবধূ। তা, সেই বা কম কিসে? তার স্বামী—"বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

পরে ফেলি, পরেই ফেলি। বন্ধুদের কাছে যাহোক একটা অজুহাত দেখালেই চলবে। কি-ই সুন্দর তাকে যে দেখায় এই কাপড়ে! সকলে অবাক হয়ে যাবে।

মনের সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে কাপড়খানা মঞ্জুলেখা পরে ফেললো। কেশবন্ধন ইত্যাদি পূর্ব্বেই হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যাশিত আনন্দে মঞ্জুলেখা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াল।

কিন্তু, কই, সে মঞ্জু কই? যার রূপ এখনও তার চক্ষে অঞ্জনের মত লেগে আছে? জামাটায় মানাচ্ছে না নিশ্চয়। জামাটা পরিবর্ত্তন করা হ'ল। এই চুলে মানাচ্ছে না তাকে, চুল অন্য রকমে আঁচড়ানো গেল। তবু কি ত্রুটি হল? সেই লাবণ্যে ঝল্‌মল্ তন্বীশ্যামার অপার্থিব রূপের কিছুমাত্র এ ছায়াতে তো ফিরে এলনা।

শাড়ীটার বোধহয় কোন দোষ হয়েছে। এতদিনের পুরাতন শাড়ী। গভীর নৈরাশ্যে মঞ্জুলেখা অঞ্চলখানা হাতে তুলে ভাল করে পরীক্ষা করল। কই, রংতো একটুও মলিন হয় নি। সেই জড়ি সোনার হাসি হাসছে। তবে কি হল, কেন ভাল দেখাচ্ছে না? যাই হোক্, এ-কাপড় পরা চলে না।

বিষণ্ণচিত্তে কাপড়খানা তুলে রাখতে রাখতে সহসা মঞ্জু-লেখার বোধোদয় হল। শাড়ীর কিছু হয় নি, হয়েছে তার নিজের। তেত্রিশ বছরের মঞ্জুলেখার মধ্যে আজ আর সেই

সপ্তদশীর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সেদিন চলে গেছে, সে লোকও চলে গেছে।

সেই বহু পুরাতন দিনগুলি, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পল্লীগ্রামে স্বামীছাড়া হয়ে পড়ে থাকতে হ'ত। সেই অকিঞ্চিৎকর দিন-গুলির কোন মূল্য দেয় নি সে।

সেদিন চারু বলল, "কি ভাবে যে পূরো পাঁচটি বছর পাড়াগাঁয়ে ছিলেন আপনি, মঞ্জুদি! অশোকবনে সীতার মত।" মঞ্জুলেখা মার্টারের হাসি হেসেছিল, প্রতিবাদ করে নি।

প্রতিবাদ করবার কথা মনে আসে নি। সে যে দুঃখে ছিলনা একথা মনে হয়নি তার।

সত্যিই কি দুঃখ ছিল? প্রতিটি প্রভাতে দিগন্তের ক্রোড়ে কি আশারশ্মি প্রতিভাত হ'ত। মনে হ'ত কি গরিমময় জীবন হবে তার! কত কি হবে! এই আশার সঙ্গে সঙ্গে তার তনুদেহ নবশ্রীতে মুঞ্জরিত হয়ে উঠত প্রত্যহ।

আজ কিছু হ'বার নেই। সেই জীবন এই জীবনের আশা দিত। এ জীবন প্রাপ্তির পরে নূতন আর কিছু নেই। এখন কেবল বার্দ্ধক্যের প্রতীক্ষা। একঘেয়ে রুটীনের চক্রান্তে জীবন তাকে বেষ্টন করে ধরেছে, যা হ'বার হয়ে গেছে। পাবার কিছু নেই, আশার কিছু নেই।

গতযৌবনা গতশ্রী, মঞ্জুলেখা, তোমার জীবনের চরম ব্যর্থতা কি মাত্র আজই তোমার চক্ষে ধরা পড়ল?

প্যারালেল লাইন

স্কুলশিক্ষয়িত্রী চলন্ত ট্রেনে কলিকাতা ফিরে যাচ্ছেন। মাঝে দিন কুড়ি ছিলেন তিনি সিংভূম জেলার 'গালুডি' গ্রামে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য। ছোট একখানা বাংলো ভাড়া নিয়েছে তাঁর মাসতুতো ভগ্নি। তারই আমন্ত্রণে ইনি শারদীয়া অবকাশটা প্রায় সেখানে কাটালেন।

সবুজ তৃণভূমির ওপর দিয়ে গাড়ী চলেছে। এঞ্জিনের ধোঁয়া মালার মত কুণ্ডলি আকারে লঘু বাতাসে উড়ছে। ধানের ক্ষেত বাতাসে ঢেউতোলা, আর পাহাড় চারপাশে স্তব্ধ।

কনক বসুর বিবর্ণ কালো চুল বাতাসে রুক্ষ, কালো পাড়ের শাদা শাড়ি আকুঞ্চিত। কয়েকদিন পল্লীগ্রামে অবাধ মাঠে মাঠে বিচরণের ফলে কলিকাতার রক্তশূন্য সাদা রং মলিন। মুখের শাণিত শালীনতা একটা গ্রাম্যভাবে ঢাকা পড়েছে। দেহ হয়েছে কিঞ্চিৎ স্থূল।

বামহাতে কোলের ওপর একখানা Elinor Glynএর চমকপ্রদ উপন্যাস ধরা, পায়ের কাছে গোটানো সুজনীর পাশে বেতের ঝুড়িতে পথের খাবার। দৃষ্টি তাঁর কিন্তু বাহিরে পথের দিকে। সেই পথ তাঁকে ক্রমেই শ্যামল গ্রাম থেকে ইঁটের পাজা সহরের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আকাশে আজ মেঘ। শ্যাম বনশ্রেণী আরো সবুজ দেখাচ্ছে। দূরে পাহাড়ের ওপর মেঘ ধোঁয়ার মত জমে আছে, আকাশ যেন নীচু হয়ে পাহাড়কে স্পর্শ করেছে। সবুজ পাহাড়গুলো মেঘের ছোঁয়া লেগে নীল হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে চারিদিক অন্ধকার করে অকালবর্ষণ নেমে এলো। তার মধ্যে, কাঁচবন্ধ গাড়ীর গদিতে বসে সীমাহীন লাইনে চলন্ত রেলে ছুটে চলায় বৈচিত্র্য আছে। শরতে বর্ষা নেমেছে, যেন এটা আষাঢ় মাস। সকাল ও বিকালের প্রভেদ নেই। জল জমে মাঠ কি বিল বোঝা ভার। দেহাতীদের খড়ে-ছাওয়া ছোট কুঁড়েগুলি কি শান্তিপূর্ণ—কনক বসু ভাবছেন। একঘেয়ে একটা শব্দে বৃষ্টি পড়ছে জলে-ধোয়া সবুজ গুল্মলতায়। ছোট ছোট পুকুর স্বচ্ছজলে কূল ছাপিয়ে উঠেছে, গাছের গুঁড়ি দিয়ে বাঁধা ঘাট। সে ঘাট আজ জনশূন্য। লাইনের ধারে লাল মাটির ডিষ্ট্রিক্‌বোর্ডের রাস্তা, কাদা বাঁচিয়ে দুই একজন পথিক ছাতা ধরে পথ চলেছে। দোকানঘরের ঝাঁপ বন্ধ, দুই একটিতে দোকানী গায়ে কাপড় জড়িয়ে বন্ধুর সঙ্গে নিশ্চিন্ত আরামে গল্প জমিয়েছে। আমার মত এরা যন্ত্রদানবে চড়ে ছুটে যাচ্ছে না, এদের কোনও গতিবেগ নেই—কনক বসু ভাবছেন। শান্তিপূর্ণ ছোট গ্রামগুলি জলের ঝাপটায় পাখীর মত গাছপালার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। এদের মধ্যে কি আছে আমি জানি না,—গাড়ীর মধ্যে আমি আছি এরা জানে না। এদের জীবনের সঙ্গে কখনও

পরিচিত হব না, তবু আজ বর্ষার ভিজে দিনটিতে আমার মনের তারে গাঁথা রয়ে গেল এই গ্রামগুলি। যদি এখানে আমি আশ্রয় পেতাম! তাহ'লে আজ মধ্যমশ্রেণীর মহিলাকক্ষে বসে উদরান্নের জন্য আমায় শহরে ছুটতে হ'ত না।

কী প্রভেদ! এই লোকেরা আর আমি! সভ্যতার জয়ধ্বজা আমার দেহে-মনে, আমার হাতে বিদেশী ভাষায় লেখা বিদেশী লোকেদের প্রেমের কাহিনী—কনক বসু ভাবছেন। এরা মিশে আছে প্রকৃতির সঙ্গে, গ্রামখানির বাহিরে যে এক বৃহত্তর জগত আছে, সে জগত যে কত বড় তাতো এরা জানে না। তাই এরা বেঁচেছে, কোনো বৃহত্তর কামনা এদের মনে জাগে না। আর, আমি চলেছি দিশাহারা ভাবে ছুটে যেখানে আমার যেতে ইচ্ছা নেই। কী প্রভেদ! তবু এক বর্ষার বিকাল আমাকে এই গ্রামগুলির সঙ্গে বেঁধে ফেলল। যদি আমায় এসব ছেড়ে চলে যেতে না হ'ত! বাহিরে তাকিয়ে কনক বসু দীর্ঘশ্বাস ফেল্লেন—"কেন আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি? সেখানে আমার জন্য কি আছে?"

খড়্গাপুর ষ্টেসনে গাড়ী থেমে রইল। খাদ্যগুলো নষ্ট করে লাভ কি? বৃষ্টি এখন থেমে গিয়েছে, কিন্তু আবার আসন্ন বর্ষণ জমাটবাঁধা মেঘের বুকে অপেক্ষা করে আছে। জানালার কাঁচ ফেলে দিয়ে কনক বসু ঝুড়িটার ডালা তুলে খাদ্যপ্রাচুর্য্য দেখে

অবাক হলেন। রিণা করেছে কি? লুচি, ভাজা, আলুর দম, মালপোয়া, কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, পান্তুয়া। মাস্‌তুতো বোন রিণা ও তার স্বামী উভয়ে খুব খেতে পারে। তাই বুঝি একজনের জন্য পাঁচজনের উপযুক্ত খাবার! গাড়ীতে বেশী লোক নেই। সামনের বেঞ্চে একদল মেয়ে স্যাণ্ডউইচ আর কেকের টুকরো কামড়াচ্ছে। ছেলেরা প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে ও সরবে তাদের চায়ের জোগান দিচ্ছে।

নিজের জন্য কনক বসু এক চা-ওয়ালাকে ডেকে কাঁচের শতউচ্ছিষ্ট পেয়ালায় না দিয়ে মাটীর ভাঁড়ে চা দিতে বল্লেন। প্লেটে করে নিজের জন্য কিছু খাবার বেছে তুলে নিলেন।

জানালার পাশে একটি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। গায়ে খাকী-রংয়ের ওয়াটারপ্রুফ জলে ভিজে ভারী হয়ে গেছে। ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে ঢাকা টুপী থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে। বয়স বছর আটত্রিশ হবে। শ্যামবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী।

"কনক, যাচ্ছ কোথায়?"—ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হাসলেন। নেত্রে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্বের দীপ্তি। সুগঠিত দন্ত হাস্যে বিকশিত হ'ল।

কনক বসুর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—"আপনি এখানে, ভূপেন বাবু? আমি তো চলেছি গালুডি থেকে ফিরে।"

জানালার কাঠে হাত রেখে ভূপেন সরে এলেন,—"আমি পরের ষ্টেসনে বদলী হয়েছি, এখানে এসেছি আমার ট্রলিখানা লোড করতে।"

"আপনার স্ত্রী-ও এখানে? ভাল আছেন সব?"

সামনের শূন্যের দিকে তাকিয়ে ভূপেন বল্লেন, "হ্যাঁ, সে-ও এখানে। কিন্তু তার শরীর বিশেষ ভাল নয়। ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী তো।"

অধ্যাপক পিতার ছাত্র হিসাবে ভূপেনের সঙ্গে কনকের পরিচয় ছিল। সে পরিচয় অন্য রূপ নিয়েছিল। পিতার অকালমৃত্যুর পর সহায়হীনা কনক বসু দেখেছিলেন ভূপেন দত্তকে বিবাহ না করে তিনি ভুল করেছেন। ওয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর পাড়াগাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়!—কনকের আকাঙ্ক্ষা উচ্চতর ছিল।

আবার গাড়ী ছুটে চলে গেল সীমাহীন শূন্যতার দিকে। আকাশ আঁধার করে আবার বৃষ্টি নেমে এল ঝরা শিউলির মত। কাঁচ তুলে দিয়ে কনক বসু খাবারের থালা চেয়ে দেখলেন, পাশে মাটীর ভাঁড়ে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ভূপেনবাবুকে কিছু খাবার দেওয়া হ'ল না। বিজয়ার পরে দেখা, এত মিষ্টান্ন রয়েছে। কনক বসুর চা ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল।

ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে গাছপালার মাথার ওপরে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে লালখোয়ার রাস্তায়। হাতের টর্চ্চ ফেলে

ভূপেন দত্ত পাশের ঝোপটা দেখলেন। বাড়ীর দিকে ফিরছেন তিনি কাজকর্ম্ম সেরে। ক্লান্ত চরণ অনিচ্ছুক।

চলন্ত গাড়ীর কামরাটি ভূপেন দত্তের মনে কেবলি ভেসে আসছে। আলোকোজ্জ্বল কামরায় কালো-শাদা চেক্ সুজনী। সামনে সযত্নে সাজানো খাদ্য ও চা, হাতে রঙীন মলাটের বই—আর সে! ওখানে যদি আমি আশ্রয় পেতাম—ভূপেন দত্ত ভাবছেন।

ঘরে রুগ্না স্ত্রী, কলহপ্রিয়া। পাড়াগাঁ ভাল লাগেনা পত্নীর, তিনি চান কলিকাতায় থাকতে। কথার বা মাথার বিশেষ ঠিক নেই তাঁর, সর্ব্বকার্য্যে ঔদাস্য। ঘরে ফিরে দেখা যাবে দয়িতা নিদ্রাগতা, ছেলেমেয়ে চীৎকার করছে। এককাপ চা চেয়ে চেয়ে অবশেষে চিনি গোলানো ঠাণ্ডা জল আসবে।

সবুজ শ্যাওলার ওপর থেকে ব্যাঙ লাফিয়ে ডোবার জলে পড়ল, বাতাস হাহাকার করে উঠল। মন যেন বশ মানে না, ট্রেণের পিছনে ছুটে চলে যাচ্ছে। বর্ষার দিনে কেন গৃহে ফিরে যাচ্ছি? যদি যেতে না হ'ত! ভূপেন দত্ত ভাবলেন,—'সেখানে আমার জন্য কী আছে?'

কুমারী

কালিঘাটগামী একটি ট্রাম এসে দাঁড়াল। মধ্যে পূর্ণবেগে পাখা চলছে,—নরম গদীর আরাম, সবই নিদাঘপীড়িত পথিককে প্রলুব্ধ করে। জানালার পাশের 'Ladies Seat' লেখা আসনে একখানি পরিচিত মুখ ভেসে উঠল। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল কলেজের শেষে বের হয়ে, এই মুখখানা রোজই দেখছি একভাবে। একটু বিবর্ণ-ক্লান্ত, একটু নিরাসক্ত, উদাসীন একটি মুখ। কানে পরিচিত মুক্তাচুনি বসানো সেই এক দুল। মানুষটির বসবার ক্লান্ত ভঙ্গি, চোখের নির্লিপ্ত, উদাস দৃষ্টি পর্য্যন্ত আমার যেন মনে গাঁথা হয়ে গেছে।

উঠে বসলাম তাঁরই পাশে। হাতে তাঁর একখানি খাতা, একটি নক্সাকাটা শান্তিনিকেতনের হাতব্যাগ। আর একহাতে ধরা একটি কালো রংয়ের ছোট ছাতা। কালো ভোমরাপাড় শাড়ী আধুনিক ভঙ্গীতে পরা, গায়ে হাফহাতা শাদা জামা। বয়স বোধহয় বছর ছত্রিশ হবে। রং শ্যামবর্ণ, গোলগাল গড়ন, চুল শিথিল-এলো খোঁপায় আবদ্ধ। দেখে বেশ বোঝা যায় ইনি কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, ছুটীর পর বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন। বেশভূষা ঈষৎ সৌখীন হলেও যেন অগোছালো।

সকালে হয়তো যত্ন ছিল, সারাদিনে সে প্রসাধনটুকু নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি এখনও কুমারী।

দৃষ্টি তাঁর ক্লান্ত, জীবনে যেন আর কিছু চেয়ে দেখবার নেই। ভারাক্রান্ত পশুর মত শ্রান্ত মুখে একটা অবিচলিত সহনশীলতা। জীবন তাঁর চলেছে একঘেয়ে ছন্দে, আর প্রত্যাশা করবার কিছু নেই। বিদ্যাদান তাঁর করতে হচ্ছে স্বেচ্ছায় নয়, প্রয়োজনে। তাঁর জন্য হয়তো কোনও নিরালা, শান্তিপূর্ণ গৃহক্রোড় অপেক্ষা করে নেই। স্বামীর ব্যগ্র উত্তপ্ত আলিঙ্গন, পুত্রের অস্ফুট কলগুঞ্জন, এসব তাঁর জন্য নেই। হয়তো আছে একটি নাবালক ভাই কিম্বা বৃদ্ধা অশক্তা মা, যাদের ভার তাঁকেই বইতে হয়।

তবু তাঁর বেশভূষায় এ সামান্য সৌখিনতা কেন? স্কুলে অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী বা ছাত্রীদের মধ্যে যেতে হয়, তাই কি? মণিবন্ধে তিনগাছি ক'রে মিশ্রীকাটা চুড়ি, নিজের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে তৈরী। হয়তো আর গয়না তাঁর নেই। কিন্তু কানের ঐ মুক্তাচুনি বসানো কর্ণভূষণ! এ যেন চিরকুমারী, রুক্ষ-শিক্ষয়িত্রীর কানে মানায় না। এ যেন তরুণী বধূর কর্ণে মাথার অঞ্চল সরে যেয়ে ঝিক্‌মিক্ করবে, অথবা সুন্দরী কিশোরীর চেলাঞ্চলের সঙ্গে জ্বলে উঠবে। যাঁকে এভাবে, এমন ক্লান্ত উদাসীন ভাবে একলা পথ চলতে দেখা যায় তাঁর কানে এই বিলাসের অলঙ্কার! দেহের সঙ্গে, সজ্জার সঙ্গে এর এত অসামঞ্জস্য যে সকলেরই চোখে পড়ে।

আমার কেন জানিনা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হয়। তাঁর নাম জানতে, তার কে কে আছে জানতে, তিনি কোথায় কাজ করেন জানতে আমার বড় ইচ্ছা করে। জানিনা কেন আমার এ নবপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা? আমার মন নিঃসঙ্গ, তাই বলে তো আমি নিঃসঙ্গ নই। আমার বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই। তবু আমার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে, নিবিড় হ'তে ইচ্ছা করে।

মনে হয় তাঁকে প্রশ্ন করি, "আপনার মুখে কেন এমন ক্লান্ত, নিরাসক্ত ভাব? আপনি জীবনে কী পাননি? Old Maid হ'তে যদি আপনার ভালো না লাগে, কেন বৃথা যৌবনকে বয়ে যেতে দিলেন? নিস্তব্ধ নিরালা রাত্রিতে চোখে যখন ঘুম আসেনা, যখন কাল স্কুলে যাবার চিন্তা, খাতা দেখার চিন্তা, অর্থের চিন্তা, ভবিষ্যতের চিন্তা সব আপনার নিদ্রাহীন মনকে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে, তখন কি মুহূর্ত্তের জন্য মনে জাগে না এক দরিদ্র কুটীরের শান্ত গৃহলক্ষ্মী হওয়া জনমণ্ডলি পরিপ্লাবিত এসপ্লানেডএ প্রত্যহ সভ্যতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে ঢের ভালো? আপনার কানে মুক্তাচুনিবসানো আশ্চর্য্য ভূষণ কেন? কার জন্য, কিসের মোহে আপনার একটিমাত্র সৌখিন সজ্জাকে প্রত্যহ ব্যবহার করে যাচ্ছেন? কোন আশা বা কোন মোহের চিহ্ন তো আপনার অনাসক্ত চাঞ্চল্যবিহীন চোখে, উদাসীন জীবনীহীন মুখে দেখা যায় না। মনে কি আপনার কোন দুঃখ আছে?"

জানিনা চিরকুমারী থাকার কোন মহত্ব আছে কি না! জানিনা চিরকুমারীদের মনে প্রেম না পাবার কোন ব্যথা, কোন যৌবনসুলভ আন্দোলন জাগে কি না। তবে এইমাত্র জানি, তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অসহ্য একঘেয়ে সুর তাদের ক্লান্ত করে, মনে হয় কেন আর একটি সবলবাহু আমার প্রতিটি দুঃখকষ্ট, ব্যথাবেদনাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে না? যদি সে চেষ্টা সফল নাও হয়, ক্ষোভ নেই! ব্যথা বওয়ার সাথী আমার আছে। আমার জীবনের চরম একাকিত্ব আর আমাকে পলে পলে হত্যা কর্‌ছে না।

গাড়ীর নরম গদীতে ঠেসান দিয়ে সারি সারি পুরুষ। কেউ ধূমপান রত, কেউবা পরচর্চ্চা অথবা রাষ্ট্রনীতিমূলক গবেষণায় ব্যস্ত। তাদের মধ্যে কেউ কি এই জীবনভারাক্রান্ত নিঃশব্দ নারী মূর্ত্তিকে-সফল করে তুল্‌তে পারত না? পারতনা কি কেউ তারা বিষাদনম্র, ক্লান্ত নয়নে উজ্জ্বলতা দিতে, ধৈর্য্যকঠিন অধরে হাসি আন্‌তে? কি প্রয়োজন ছিল তাঁর নিজের দীনতা, সহস্র চিন্তাজাল একা বহন ক'রে ফার্ষ্ট ক্লাশ ট্রামের এক কোণে বসে উদাস দৃষ্টিতে চৌরঙ্গির জনতার দিকে চেয়ে থাকার? প্রত্যাখান পুরুষ করেছে তাঁকে—তাই এই হৃদয়ভারাতুরা কুমারী ক্লান্ত দেহকে টেনে নিয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে উপার্জ্জনের চেষ্টা করছেন।

মনে আমার বড় সাধ হ'ল জিজ্ঞাসা করি একবার, "সত্যি

কি আপনার মনের কথা এই ? না আপনার সম্বন্ধে বাহিরটা দেখে আমার এ অনুমান মাত্র ?”

কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার সাহস কোথায় আমার ? হয়তো তিনি বল্‌বেন “যাও বাছা, পাকামি কোরনা, বাড়ী যাও ।”

কি করে বুঝাব তাঁকে আমার জীবন তরুণ বলেই আমার সময় আছে তাঁর কথা ভাববার, মনে মনে আলোচনা করবার। আমার যৌবন আছে বলেই বিগতযৌবনা নারীর হৃদয়ব্যথা আমার সহানুভূতির সঙ্গে স্পর্শ করবার ক্ষমতা আছে। যন্ত্র-সভ্যতার যুগে সহস্র নরনারীর মত ট্রাম-আরোহিনীর ক্লান্ত, করুণ মুখ একবার মাত্র কটাক্ষে দেখে নিয়ে তাঁকে মন থেকে ঝেরে ফেলে দেবার ক্ষমতা এখনও আয়ত্ত করিনি।

কিছুক্ষণ পরে এক দম্পতী গাড়ীতে উঠলেন। তাঁরা যে দম্পতী সে কথা বলে দেবার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির দরকার করে না। খস্‌খসে শাড়ীর ঔজ্জ্বল্যে, এসেন্সের গন্ধে সারা ট্রামটা চকিত করে তাঁরা আমাদের সামনের আসনে বসে পড়লেন। তরুণীর প্রসন্ন নয়নে শান্তি, অধরে তৃপ্তির হাস্য।

আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে উঠলেন। ঈষৎ বিষাদ-স্তিমিত, সুদূর নির্লিপ্ত ভাবটি ক্ষণকালের জন্য কেটে যেয়ে যেন একটু সামান্য মনোযোগের চিহ্ন মুখে দেখা দিল। তাঁর চেনা নয় এরা, তবু তিনি তৃষিত দৃষ্টিতে তরুণীর একান্ত নির্ভরশীল মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

একটু দূরে গিয়েই তাঁরা নেমে গেলেন। আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী কৌতূহলী হয়ে মুখটা ঈষৎ বের করে চেয়ে রইলেন। তরুণীর হাতখানা ধরে টেনে তাঁর তরুণ স্বামী তাঁকে ধাবমান একটা মোটরের আক্রমণ থেকে বাঁচালেন। তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাহিরে চলে গেলেন।

সহসা পাশে একটা মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেলাম। চকিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে আবার তাঁর মুখের সেই ক্লান্ত, উদাস ভাবটা ফিরে এল!

কালীঘাটে ট্রাম থামলো। আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা হ'ল না, তাঁর মনের কথা জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। আমি নেমে চলে এলাম! শুধু মনে রইল—অগোছালো সামান্য বেশভূষার মধ্যে কানে সেই মুক্তাচুনি-বসানো দুল, আর নির্লিপ্ত ঔদাস্যের মধ্যে একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস।

বধূ

যাবার মধ্যে তো 'করমজা' থেকে কলিকাতা, পূজার বন্ধে শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী। তার আয়োজনেই মালঞ্চ অস্থির হয়ে উঠেছে। সখ করে বড় ভাই 'ঠাকুরদাদার ঝুলির' নজিরে তার নাম 'মালঞ্চমালা' রাখলেও তুলনাটা নামেই সমাপ্ত। বাংলা দেশের অন্যান্য কালো মেয়ের মত যথাসময়ে বিয়ে হয়েছে তার এক জমিদারের আই-এ পাশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে। সংসারে তার কাজ অনেক, ছেলেমেয়ে একুশ বছর বয়সে তিনটি। শ্বশুর উদাসীন; লোককে পথ থেকে অসময়ে ডেকে এনে পর্য্যাপ্তভাবে খাওয়ানো আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে দাবাখেলা ভিন্ন অন্য কোন জাগতিক বিষয়ে তাঁর উৎসাহের একান্ত অভাব। শাশুড়ি শুচিবাইগ্রস্তা, পূজা-পর্ব্বে ঝোঁক আছে। বড় জা তো অনেকদিনই সিঁথির সিঁদূর ঘুচিয়ে ফেলেছে। তাই সেও সংসারের বাইরে। সুতরাং সংসারটি অনেক লোকের হলেও কাজ একা মালঞ্চের।

আজ তিন বছর হ'ল বাপের বাড়ী যাওয়া হয়নি তার। এবারে অনেক বলে বলে সবাইকে সে রাজী করেছে। গত বছর ছোট বোনটা মারা গেল নিউমোনিয়ায়। মা কেঁদে চিঠি দিলেন তাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কাজের অজুহাতে

শ্বাশুড়ি মত দিলেন না। তার কোলের ছেলেটাকেও মা দেখেন নি। দূরে বিয়ে দেওয়ার মজা এখন বোঝা যাচ্ছে।

রান্নাঘরের মাটীর দাওয়ার ওপর বসে মালঞ্চ নারকোলের নাড়ু পাকাচ্ছিল। বিজয়ার দিন প্রণাম করতে আসলে পাড়ার সবাইকে মিষ্টিমুখ করাতে হবে। সমস্ত কাজ সেরে, সংসারের সব দাবী মিটিয়ে দিয়ে তবে একমাসের ছুটী মিলবে। শ্বশুর সরুচাক্‌লি পিঠে খেতে ভালবাসেন। মাটীর কলসীতে এক কলসী চালের গুঁড়ো মালঞ্চ কুটে রেখেছে। শ্বাশুড়ির জন্য 'বেড়ার' হাট থেকে দু' তিন মাসের মত কাঁচামুগের ডাল কিনিয়ে এনেছে। বড় জায়ের পাতার গুঁড়ো করে দিতেও সে ভোলেনি। বড় জায়ের একমাত্র ছেলের লিভারের অসুখ। তার জন্য নানারকম শিকড় বেঁটে সন্ধব লবণ মিশিয়ে হজমী বড়ি এক শিশি করে দিতে হ'ল। স্বামী রাগী মানুষ, হাতের কাছে কিছু না পেলে বিরক্তির সীমা থাকে না! আজ পাঁচছয় দিন হ'ল সভয়ে মালঞ্চ তাকে তামিল দিচ্ছে, "ওগো, তোমার দাঁতের মাজন চকখড়ি গুঁড়ো করে টিনের কৌটোটাতে রেখে গেলাম ঘরের কুলুঙ্গীতে। তোমার ভালো ধুতি দু'খানা বাক্সের তলায় রইল, দরকার হ'লে বের করে নিও। আর শীতের আগেই তো ফিরে আসছি, তবু গরম কোটটা হাতের কাছেই রেখে গেলাম। আর, তোমার হরতকী কাটা রইল সিন্দুকের পাশে মাটীর ভাঁড়ে; যদি আরো লাগে—"

বাধা দিয়ে অসহিষ্ণু যতীশ চেঁচিয়ে উঠেছে, "থামো, থামো। তুমি কিছু বাপের বাড়ী গেলে আমাদের সংসার অচল হবে না!"

রাত্রে সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাসি পাচ্ছিল মালঞ্চের। এই সংসারের দোহাই দিয়েই তো বাপের বাড়ী যাওয়া হচ্ছে না তার। হিন্দু ঘরের মেয়ে, তাকে বিয়ে করে পুরুষ নারী জন্ম ধন্য করে দিয়েছে এই সংসারের জন্য। একাধারে দাসী, পাচিকা, সেবিকা যে অন্যত্র দুর্লভ। প্রেমের প্রয়োজন? তা, টাকা ফেল্লে দেহের দাবী মেটাতে অনেক নারী মেলে। কিন্তু সব কয়েকটির একত্র সমাবেশ বিবাহিতা স্ত্রীতেই সম্ভব। এক্ষেত্রে আবার বংশরক্ষার ব্যবস্থাও আছে। তাইতো আজ বাংলার গৃহে গৃহে এই সব রমণীর প্রাচুর্য্য, যাদের সহধর্ম্মিণী বলতে কেবল শয্যাসঙ্গিনী বোঝায়; যাদের ক্লান্ত অসহায় মুখে, দীপ্তি-হীন নেত্রে যুগান্তের শ্রান্তি, ভীতিসঙ্কুল পরাধীনতা লেখা রয়েছে। আত্মা তাদের নেই, মন তাদের হত্যা করা হয়েছে! দিনের পর দিন চোখবাঁধা কলুর বলদের মত তারা সংসারের চাকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে, অবাঞ্ছিত সন্তানের পাল লালন করছে। শ্বশুর শ্বাশুড়ির সেবা করে, ননদ জায়ের মন জুগিয়ে, স্বামীর সমস্ত দাবী মিটিয়ে তবে না বধূ নামের সার্থকতা! যদি কখনও বাবা, মা, ভাইবোনের জন্য মন খারাপ হয় তবে সেটা ন্যাকামী; যদি নিদারুণ গঞ্জনায় মুখে একটি কথা আসে তবে.

সেটা পাপ। কেরাণীর ছুটী আছে, দাসদাসীর ছুটি আছে বধূর নেই।

স্বামীর বাহুবন্ধনে অভ্যস্ত নিশ্চেষ্টভাবে ধরা দিয়ে মনে মনে মালঞ্চ ভাবছিল। রংএর মালিন্যর জন্য কাছাকাছি কোথাও বিয়ে হ'ল না তার, হ'ল এই দূর পাড়াগাঁয়ে। তাওতো মায়ের হাতের চুড়িগুলো গেল, পঁচিশ ভরি সোনার কমে এঁরা রাজী হ'লেন না। কলিকাতায় মানুষ মালঞ্চ, প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ী এসে কান্না পেত। সন্ধ্যা হলে মিট্‌মিটে রেড়ির তেলের প্রদীপ, ঝোপেঝাড়ে শেয়ালের ডাক। রাত্রি আটটা হ'তে না হ'তে সারা গা খানি নিঝুম। আশেপাশে দু'চার ঘর ব্রাহ্মণ আছে তাদের মত, কিন্তু মেলামেশার সময় কারুর নেই। পূজাপার্ব্বণে দেখা হয় মাত্র। আগে মন বড় কড়কড় করত মালঞ্চের, এখন সয়ে গেছে।

তিন বছর কলিকাতার মুখ দেখেনি সে। বন্দী জীবন এবারে কিছুদিনের জন্য শেষ হবে তার। আবার বাসে চড়ে এখান ওখানে মাঝে মাঝে বেড়ানো, কথা-বলা বায়স্কোপ দেখা! আবার দোতলায় বিজলী আলোয় বসে পাশের বাড়ীর মীরার সঙ্গে গল্প! একঘেয়ে জীবনের নিরানন্দে মরে যাচ্ছে সে। অনেক আরাধনায় মুক্তি আসছে। আবার মায়ের কোলের কাছে বসে গরম জিলিপি সে খাবে; আবার বাবার মাথার পাকা চুল তুলে দেবে শোন্ দিয়ে। দাদা বউদির ঘরে এবার আড়ি সে পাতবেই।

বড় বোনের মেয়ের গলার কীর্ত্তন রোজ একটা করে শুনবে। আর পাঁচটা দিন মাত্র! ছোট ভাই অমল চতুর্থীর দিন তাকে নিতে আসবে। ভাবতে আনন্দে মালঞ্চ শব্দ করে হেসে ফেলল।

মুখের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে যতীশ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "বাপের বাড়ী যাবার আনন্দে হাসি নাকি? যত সব কলকাতার বিবি ঢং! ওসব জায়গায় যেয়ে মাথা গরম করা আমি ভালোবাসি না।"

অনুতপ্ত হয়ে মালঞ্চ তখনি স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে।

কাল মালঞ্চর ভাই আসবে। সকাল থেকে সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যাত্রার আয়োজনে রাজসূয় বাধিয়ে তুলেছে মালঞ্চ। বড় মেয়ে মীনুকে দিয়ে খোকাদের জামা, ইজের সমস্ত পাট করে তুলছে রংচটা বিয়ের তোরঙ্গে। শ্বাশুড়ির মুখঝাম্টা, স্বামীর বিরক্তি, বিদ্রূপ আজ কিছুই তার লাগছে না। দূর আকাশের প্রান্তে কাশফুলের মত মেঘের মাথায় তার আহ্বান এসেছে। জামরুল পাতার মসৃণ চাকচিক্যে সূর্য্যের আলো পড়েছে। সেও তাকে ডাকছে। কাল সে চলে যাবে নিজের পরিজনের স্নেহবেষ্টনে, তার বাল্যনিকেতনে। বিজয়ার ব্যথার সুর তার মনে বাজবে না, তার জগতে একমাস এখন চির মহালয়া। কাল থেকে এক মাস, ভোরে উঠে পুকুর থেকে জল টানতে টানতে সুদূর কলিকাতার কথা ভেবে নিশ্বাস ফেলতে হ'বে না।

বেলা তিনটার সময়ে দ্বিতীয়বার স্নান করে সকলের শেষে একা রান্নাঘরে ঠাণ্ডা ভাতডাল গলাধঃকরণ করতে করতে মায়ের আদরের জন্য গোপনে ময়লা আঁচলে চোখের জল মুছতে হ'বে না। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর জায়ের হাতে বাতের তেল মালিশ করতে করতে শহরের স্বপ্ন সে দেখে বিমনা হ'বে না। আবার আনন্দ, আবার উৎসব।

মীনু তার মায়ের একটা তালি দেওয়া সেমিজ পাট করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, "আমার কাপড় কি নেব মা? দুখানা তো মোটে; তাও ছিঁড়ে রং উঠে গেছে।"

নিশ্চিন্তভাবে মালঞ্চ বলল, "ও থাকগে। দিদিমা তোকে নতুন কাপড় কিনে দেবে।"

মীনু নেচে উঠল, "বুলার মত, মা?" বুলা মালঞ্চের বড় বোনের মেয়ে, কলিকাতায় তারা থাকে, অবস্থাও ভাল। তার ঢাকাই শাড়ীর ওপর মীনুর লোভ।

"দেবে, দেবে তাই।" মেয়েকে আশ্বস্ত করে মালঞ্চ নিজের হাতের চুড়িগুলোর দিকে চাইল। কয়েকটা টাকা জমেছে তার, মাকে বলে এবার সে পাশের বাড়ীর মীরার হাতের চুড়ির মত চুড়ি গড়িয়ে নেবে। বিয়ের চুড়িই হাতে রয়েছে তার, ক্ষয় হয়ে গেছে, গড়নও সেকেলে।

মালঞ্চের আশা আনন্দের স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল শাশুড়ির

চীৎকারে। "ও বউমা, বলি শুনছ? এদিকে এসে বাঁশ থেকে লেপখানা পেড়ে দাও, তোমার শ্বশুরের যে জ্বর এল।"

"বাপের বাড়ী যাবার আয়োজনে মত্ত! বাক্স সাজানোর ধুম পড়েছে। যাওয়া বন্ধ হয় কিনা দেখ তো আগে?" ক্রূর-হাস্যে যতীশ বলে উঠল।

হাতের কাপড় নামিয়ে মাথায় আঁচল টেনে মালঞ্চ বেরিয়ে এল। ভয়ে তার বুক তখন কাঁপছিল। শ্বশুরের অসুখের সময়টি বেশ ভালো। এবারে স্বামী আর শ্বাশুড়ির ছুতোর অভাব নাও হ'তে পারে। মনে মনে সিদ্ধেশ্বরীতলায় একটা মানত করে ফেলল মালঞ্চ।

মানতের জন্যই বোধহয় দ্বিপ্রহরে শ্বশুরের জ্বর কম হ'য়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে আবার জ্বর বেশী হ'ল; দু' একটা ছোটখাট উপসর্গও দেখা দিল। গ্রামের ডাক্তার এক টাকা ভিজিট নিয়ে রোগী দেখে মন্তব্য করলেন, "ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'তে পারে, আবার টাইফয়েডও হ'তে পারে। দু'চার দিন না দেখে বলতে পারছি না।"

ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে যতীশ সোজা হবিষ্যি ঘরের বারান্দায় উঠল। সেখানে মালঞ্চর শ্বাশুড়ি নারায়ণ শিলার লেপের ওয়াড় সেলাই করছিলেন সরু লাল পাড় তসর পরে। জা বৈকালীর দুধ জ্বাল দিচ্ছিল তোলা উনুনে।

ঘরের মধ্যে শ্বশুরকে বাতাস দিতে দিতে হঠাৎ মালঞ্চ কান খাড়া করে কি যেন শুনল, তারপর পাখা রেখে সকুণ্ঠভাবে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল।

মালঞ্চর আবির্ভাবে তার শ্বাশুড়ি একটু যেন বিব্রত হ'লেন। পরক্ষণেই গলা ঝেড়ে নিয়ে বল্লেন, "তা বউমা, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে। আমি আর যতীশ বলাবলি কচ্ছিলাম তোমার তো আর যাওয়া হয় না।"

মালঞ্চর বুকের মধ্যে অস্থির করে উঠল, গলা যেন শুকিয়ে এল। স্বামীর সান্নিধ্যে মাথায় বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে চাপা গলায় কোন রকমে প্রশ্ন করল, "কেন মা?"

"শোন কথা? আবার বলে কেন?" শ্বাশুড়ি গালে হাত দিলেন। "শ্বশুরের এমন অসুখ, কি হয় ঠিক নেই। আর তুমি যাবে বাপের বাড়ী হাওয়া খেতে?"

"এখন তো জ্বর কম মনে হচ্ছে, মা। আর এতো সর্দ্দি জ্বর, দু'দিনেই সেরে যাবে। কাল অমল আসছে নিতে। এতদিন পরে—" মালঞ্চর ভীরু অনুনয়ে বাধা দিয়ে যতীশ ধমকে এল— "সর্দ্দিজ্বর হ'লেও তো তিন দিন দেখতে হবে? না হয় পূজোর পরেই যাবে। অমল আসছে, না হয় বড়মানুষ ভাই দুদিন গরীব ভগ্নীপোতের ভাত খাবে।"

খোঁচাটা আজ মালঞ্চর গা ছুঁল না। সে ভাল করে জানে পূজোটা তার সৌখিন ভাই কখনই এ পাড়াগাঁয়ে কাটাবে

না ; আর একবার এত খরচপত্র করে লোক পাঠালে এ বছরে আর তার মা-বাবা লোক পাঠাবেন না।

মরিয়া হয়ে মালঞ্চ বলে চলল, "বাবা মা কত আশা করে আছেন, মা। না গেলে তাঁরা কত কষ্ট পাবেন। তিন বছর যাইনি আজ না কাল করে। এবারে আর অমত করবেন না মা। এ কটা দিন না হয় দিদি—" মালঞ্চ জায়ের দিকে করুণ দৃষ্টি পাঠাল। উদাস দৃষ্টিতে আকাশে চেয়ে দিদি এবারে কথা বল্লেন, "আমাকে আর সংসারে জড়িও না তোমরা। পূজোর কটা দিন তো সিদ্ধেশ্বরী তলায়ই কাটবে আমার।"

যতীশ আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ওঃ, কথার যে পাঁচ কাহন! বাপের বাড়ী যাওয়ার নামে পাখা মেলে ধরেছেন, শ্বশুরের অসুখ গ্রাহ্য নেই! এখানকার লোকেরা মানুষ নয়, না ? এ যাওয়াই তোমার কাল হয়েছে। আমার হুকুম তুমি যেতে পাবে না।"

পলকে মালঞ্চর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, কাঠের খুঁটাটা সে সজোরে চেপে ধরল। ছেলের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে শ্বাশুড়ি প্রসন্ন কণ্ঠে উপদেশ দিলেন, "তা আমি বলি বউমা, এবারে তোমার যাওয়া নিয়ে যখন এত বাধা, একেবারে না যাওয়াই ভালো। সামনের পূজোয় আমি নিজে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কাল ভাই আসছে আসুক। তাকে বুঝিয়ে ফেরৎ পাঠালেই হবে। দেখছ তো অবস্থা সংসারের। একদিন তুমি না থাকলে চলে না। তার ওপর অসুখী লোকটা পড়ে রইল

বউ মানুষ তুমি, ঝট করে সব ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়া কি তোমার সাজে? নিজের শ্বশুরের অসুখ, তাও দেখবে না? এ কি অন্যায় বাছা!"

মালঞ্চ কোনও উত্তর দিল না। কেন জানি না আজ শ্বশুরের অসুখ তাকে একটুও বিচলিত করল না। স্বামীর রাগ, শাশুড়ির ধিক্কার কিছুই তার বধূসুলভ কর্ত্তব্যে আঘাত দিয়ে সজাগ করতে পারল না। আজ কেবলি তার মনে হতে লাগল, অন্যায় তারই ওপরে করা হচ্ছে চিরদিন।

জননী

আমার মেজদা মাঝে মাঝে অফিসের কাজের জন্য কলিকাতার বাইরে গেলে আমাদের ভাইবোনদের কারুর যেয়ে বৌদির ঘরে রাত্রে থাকতে হয়। গত রবিবার মেজদা তাই বহরমপুর গেলে মা শোবার আগে রাত্রে আমাকে ডেকে বল্লেন, "মীনু, যাওতো তুমি তোমার মেজ বৌদির ঘরে শোওগে লক্ষ্মী।" আমার চোখে তখন অগাধ নিদ্রা, রাত্রি এগারোটা বেজেছে। সমস্ত দিন হৈচৈ করি, রাত্রে শোবার সময়ে একপল দেরী সহ্য হয় না। শুভ্র শয্যাতল আমার দক্ষিণা বাতাসে অপেক্ষমান, মায়ের পাশে শুয়ে রাত্রে ঘুমোনোর অভ্যাস অতি দৃঢ়। সুতরাং অপ্রসন্ন হয়ে আমি খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি আমার পাঁচ ভাইবোনের সর্ব্বকনিষ্ঠা। ছোট ছেলেমেয়ের উৎপাত আমার ভালো লাগেনা। এদিকে মেজবৌদির পর পর তিনটি সন্তান, তাদের কেউ সাবালকত্ব পেয়ে উঠতে পারে নি। আপত্তির কারণটা প্রধানতঃ তাই।

মা জরদার রূপোর শিশি খুলে একগুলি লক্ষ্ণৌর জর্দা মুখে ফেলে আমাকে মোলায়েম সুরে ভজনা কর্ত্তে লাগলেন, "ছি মীনু, মাধবী কি একা ঘরে শুতে পারে? একখানা রাত বইতো নয়! লক্ষ্মী মাণিক, যাও।"

অগত্যা অনিচ্ছুক গতিতে ত্রিতলে উঠলাম। সামনে ঢালা বারান্দা। টবে রজনী-গন্ধার মৃদু সৌরভ ভেসে এল যেন আমাকে আবাহন করার জন্য। মনের ভারটা লঘু হয়ে গেল, বৌদির গৃহে বেশ আনন্দের সঙ্গেই প্রবেশ করলাম।

প্রকাণ্ড ঘর, কিন্তু জোড়া খাটে প্রায় ঢেকে গেছে। ময়দানের মত প্রশস্ত বিছানা পাতা, নীল আলো জ্বলছে। বৌদি সবিনয়ে বল্লেন, "একটু ওধার দিয়ে ঘুরে এসো মীনু, মেজেতে দুধ পড়েছে।"

মোজাইক দুগ্ধে পিচ্ছিল। বৌদির সাবধান করা সত্ত্বেও কেমন করে যেন পা হড়কে গেল। পাশের টিপাইখানা সজোরে আঁকড়ে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা লেগে মার্বেলটপ টিপাই থেকে বৌদির বড়ছেলের রাত্রের রসদ গরম দুধের ফ্ল্যাস্ক মেজেতে উল্টে সব দুধ গড়িয়ে পড়ে গেল। সেই শব্দে মেজসন্তান লীলা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

বৌদি তাকে সন্তর্পনে চাপড়াতে চাপড়াতে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "বড়খোকাকে আজ রাত্রে বিস্কিট দিতে হবে। এখন ঠাকুর চাকর সকলে শুয়ে পড়েছে। ঘরে দুধও আর নেই।"

অনুতপ্ত চিত্তে কাঁচের পাল্লার আলমারী খুলে কয়েকখানা থিন্ এ্যারোরুট বিস্কিট বার করে বৌদির নির্দ্দেশমত শয্যা-শিয়রে রক্ষা করলাম। তারপরে আবার বিছানার দিকে অগ্রসর হ'লাম। ঘর বড়, কিন্তু আসবাবও বেশী। প্রায় অন্ধকার,

শুধু ম্লান নীল আলো জ্বলছে। ড্রেসিং টেবিলে সহসা একটা খোঁচা লেগে গেল।

বিব্রত ভাবে মশারির নিকটবর্ত্তী হওয়ামাত্র ফিরে যেয়ে পা ধুয়ে আসতে হ'ল।

অবশেষে মশারিখানা তুলে শয্যায় পৌঁছালাম। মনে হ'ল এবার শান্তি, কিন্তু বৌদির ছোট ছেলে তৎক্ষণাৎ অস্ফুট কাকলীর সঙ্গে আমার বিছানায় গড়িয়ে চলে আসল।

বৌদি শশব্যস্তে লীলাকে ছেড়ে ছোটখোকাকে সরিয়ে আনতে গেলেন। অনেক গোলমাল ও বাদ প্রতিবাদের পর তবে সে আমাকে দখলী সত্ত্ব দিতে রাজী হ'ল।

তখন আমার মন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। কি যন্ত্রণা! রাত্রে মানুষ কোথায় নিরিবিলিতে একটু ঘুমোবে তা না যত সব হ্যাঙ্গাম ছেলেপিলে নিয়ে! নিজের উপর করুণায় তখন আমি বিচলিত! আমার পাশে বসে যে মেয়েটি দুরন্ত ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ক্লান্ত নয়নে অলস হয়ে পড়েছেন, তাঁর দুঃখ তখন আমাকে স্পর্শও করতে পারল না। ক্রমাগত রাতের পর রাত জেগে এতগুলি রুগ্ন ও আবদেরে শিশু নিয়ে তাঁর জীবন কাটে কোন সুখে?

রাত্রি বোধ হয় একটা হ'বে।

মৃদু শব্দে জেগে উঠলাম, চিরকাল আমার ঘুম সজাগ। বউদি তাঁর বড় সন্তানকে বাহির থেকে এনে শোওয়ালেন।

খোকার আব্দার সকলের ওপরে। জ্যেষ্ঠত্বর দাবী নিয়ে মায়ের সেবারও বড় অংশ চাই তার। বিছানায় শুয়ে সে হুকুম দিল, "মা, পা ব্যথা করছে। টিপে দাও।"

বউদির নিদ্রাকাতর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ আমার মনে হ'ল হয়তো এঁর দুঃখ আমার একদিনের সুনিদ্রার অভাবের চেয়ে অনেক বেশী। তাই স্বরে সহানুভূতির আমেজ জড়িয়ে বল্লাম,—"এদের সবাইকে নিজের কাছে রাখো কেন? ঝিএর কাছে একজনকে অন্ততঃ দিলেই হয়।"

সচকিতে আমার দিকে চেয়ে চাপা, ভীরু গলায় বৌদি বল্লেন, "মা যে ভালবাসেন না, ভাই।"

ঠিক কথা! আমার মনে ছিলনা। আমার মা যে বহু স্ত্রী-সঙ্ঘের সভ্যা, 'শিশুহিত' সমিতির প্রধান পাণ্ডা। মনে পড়ে গেল জরদাসুবাসিত মুখে মাতার বক্তৃতা,—"দেখ মাধবী, তোমার ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হবে তোমার নিজের। ঝি চাকরদের হাতে কি ছেলেপিলে ছেড়ে দেওয়া উচিত? ওরা পিশাচ, টাকা ছাড়া ওদের কি টান বলো? আর ঘরের কাজ তো তোমায় তেমন করতে হয় না। এখন না হয় সন্তানদের জন্যে একটু কষ্ট করলে।"

একটু কষ্টই বটে! আদর দিয়ে ছেলেমেয়েকে মাথায়

তুলব আমরা সকলে, আর মানুষ করবে একজন—তাদের মা!

নানা চিন্তায় কখন গাঢ় তন্দ্রা এসেছে জানিনা। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার চমকে ঘুম ভেঙ্গে শুনি ছোটছেলেকে নিদ্রাশিথিল হস্তে চাপড়াতে চাপড়াতে বউদির ঘুম-পাড়ানী ছড়ার মৃদু গুঞ্জন-সুর। স্বপ্ন-জাগরণের মধ্যে মনে হয় যেন সে সুর আমার পাশের বিছানা থেকে শুধু আসছে না। সে সে যেন সারা বাংলা দেশের জননীদের ক্লান্ত স্বরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। আধো ঘুমন্ত চোখের সামনে ভেসে আসে কত শত শত রুগ্ন, রোরুদ্যমান শিশুর শিয়রে কত রুগ্না সূতিকাগ্রস্তা জননী, ছেলেমেয়ের উৎপাতে যাদের মুখের যৌবনসুলভ লাবণ্য মুছে গেছে, যাদের অসহায় নয়ন অতৃপ্ত-নিদ্রালাঞ্ছিত।

সহসা একটা ঝাঁকুনী লেগে একেবারে জাগ্রত অবস্থায় উঠে বসলাম। দেখলাম বউদির দ্বিতীয় সন্তান সবেগে বিস্কিট ধ্বংস করছে আর আমার গায়ে ক্রমাগত ঠেলা দিয়ে বিশ্রী ভাবে হাসছে। তার বাঁ হাত খানা চেপে ধরে বউদি আধ শোয়া ভাবে মাথা নামিয়ে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

বড় রাগ হ'ল। মজা দেখ মেয়ের! উনি ঘুমের ঘোরে লীলার বাঁ হাত ধরে রেখে ভাবছেন মেয়েকে আমার খুব শাসনে রেখেছি, এদিকে গুণধরী ঠেলা দিয়ে দিয়ে ঘুমন্ত লোককে ডেকে তুলে মজা দেখছে। কি অন্যায়! দয়া করে ঘরে শুতে এসেছি,

তাও পদে পদে ঘুমের ব্যাঘাত! বউদি যেন জানেন না ভালো ঘুম না হ'লে আমার মাথা ধরে? রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়ে বউদিকে তুলে বাক্যবাণ বর্ষণ করব ব'লে হাত বাড়ালাম। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে আমার ঘুম থেকে তোলা হ'ল কই?

তখন প্রায় শেষ রাত্রি। পাণ্ডু প্রভাতী আলো নীল বিজলি বাতির সঙ্গে মিশে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। সেই আলোতে দেখলাম তিন সন্তানের পাশে সুপ্তা এই উনিশ বছরের মেয়েটির অধরে, ললাটে কি যুগান্তের শ্রান্তি লেখা রয়েছে!

আধুনিকী

বালিগঞ্জে লেকের ধারে বসেছিলাম খুকুকে নিয়ে। সদ্য-জ্বরমুক্তা খুকুর বেড়াতে যাবার আঁবদার আজকাল তার মায়ের রাখতেই হয়। সহসা দেখলাম আমাদের মিলামাসী ব্যাপারীর পালতোলা ভারী পান্সীর মত ইতস্ততঃ অথচ নির্ভুল গতিতে এদিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ডাক্তারের নির্দ্দেশমত প্রত্যহ বৈকালিক ভ্রমণ তাঁর একটি অবশ্য কর্ত্তব্য। গায়ে তাঁর চিরাচরিত প্রথা অনুসারে পাতলা শাদা র‍্যাপার জড়ানো। শীত-গ্রীষ্ম নির্ব্বিশেষে বাতাধিক্য হেতু তাঁর স্থূল কলেবরকে আবৃত করে রাখে পশমী কাপড়। আজ তাঁর সঙ্গে স্বামী বা কন্যা রেণু নেই, আছে একটি দুর্ব্বল কিশোর, যারা সামান্য স্নেহপ্রকাশের বিনিময়ে বয়স্কা মহিলাদের হাতের লাঠি হয়। মিলামাসী আমার মাসীমার একজন বান্ধবী মাত্র, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের ছোট পরিধির মধ্যে এই পাতানো মাসীরা অবাধে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। সুতরাং তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর আহ্বান জানালাম, “মিলামাসী যে, আসুন, আসুন।”

মিলামাসী ঈষৎ উৎফুল্ল হ’লেন, তাঁর মুখের নিত্যনৈমিত্তিক অসন্তোষের ভাবটা কেটে গেল।

“বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ’ল, অনুভা। যাওনা

-তো ওদিকে। আর যাবেই বা কি করে? যে ভোগা ভুগল তোমার মেয়ে! যাহোক, এখন খুকু ভাল হয়ে গেছে, রক্ষা পেয়েছ।" হাঁপাতে হাঁপাতে মিলামাসী মাটীতে ধপ করে বসে পড়লেন। "অনুভা, সঙ্গে তোমার গাড়ী আছে তো? তাহ'লে আমাকে পথে নামিয়ে দিও। দু'টো কথা বলি তোমার কাছে বসে। বড় অশান্তিতে আছি।" আমার স্বীকারোক্তি শুনে মিলামাসী বাহনটিকে বিদায় করে দিলেন।

"অনুভা, বড়ই ভাবনায় পড়েছি রেণুকে নিয়ে। আপন লোক তুমি, সবি জান। এই মাসে পঁচিশে পা দিল রেণু। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তো বিয়ের কিছু করতে পারলাম না।"

বিব্রত হ'লাম। যখন কন্যার অরক্ষণীয়তা নিয়ে স্বয়ং তার জননী ক্ষোভ প্রকাশ করেন তখন কিঞ্চিৎ সাবধান হয়ে কথা বলতে হয়। অধিকার ও অনধিকারের সীমারেখাটি বড়ই সূক্ষ্ম। সুতরাং অতি মামুলী বাঁধাবুলিই ব্যবহার করলাম, "রেণুর মত মেয়ের আবার পাত্রের অভাব?"

মিলামাসী তাঁর বিশেষ প্রিয়, অভ্যস্ত ভঙ্গী অনুসারে সম্মুখে হস্ত দুইখানি প্রসারণ করে বল্লেন, "আমার কপালে অভাবটাই তো দেখছি। মেয়ের জন্যে মাস মাস একশো টাকা ভাড়া গুণে কলকাতায় বাসা বেঁধে বসে আছি। আমরা বাইরের লোক, কলকাতাটা আমার-ওঁর কারুরই তেমন সহ্য হয় না। ওঁর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কেবল রেণুর ভবিষ্যৎ

ভেবেই আমরা এখানে পড়ে আছি। কিন্তু কোন সুবিধাই হ'ল না।"

"সত্যি মাসীমা, সতীশ লাহিড়ী যে কি করল!"—আমার সহানুভূতিতে মিলামাসী একেবারে আকুল হয়ে উঠলেন, যেটুকু দ্বিধার আড়াল ছিল তাও ভেঙ্গে গেল। নানা অবান্তর কথা তিনি বলে যেতে থাকুন, আসল গল্পটা আমি বলি।

রেণুকা সেন পাঠ্য-অপাঠ্য বহু পুস্তক পড়ে বি-এ পাশ করেছে। গান গায় সে ভাল, গান বোঝে আরও ভাল। কাব্য-চর্চ্চাও করে মাঝে মাঝে। নানা রং গুলে চলনসই ছবি আঁকে দেখেছি। পিতা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চদরের সরকারী চাকুরিয়া। রেণুকা সুন্দরী।

সতীশ লাহিড়ী সুপাত্র, কথা দিয়েছিল পছন্দ হলে ভিন্ন জাতি ও ধর্ম্ম বিবাহের বাধা হ'বে না। তাই আশ্বস্ত হয়ে মিলামাসী সতীশকে বহুদিন ধরে স্বামীর কষ্টার্জ্জিত পেনসনের টাকা খরচ করে নানা সুখাদ্য খাইয়ে, তাঁর নিজের মতে, দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিলেন।

"খাও সতীশ খাও, এ নিমকী তোমার জন্যে রেণু নিজে ভেজেছে।"

"খাও সতীশ খাও, এ কেক সারা দুপুর ধরে রেণু নিজের হাতে তৈরি করেছে তুমি আজ আসবে বলে।"

"খাও সতীশ খাও। তুমি কি কি ভালবাস আমার রেণুর কণ্ঠস্থ।"

যখনি যেতাম এই ধরণের কথা মিলামাসীর মুখে ক্রমাগত শুনতাম। মনে হ'ত মিলামাসী আহার্য্যের সঙ্গে প্রেমের একটি প্রকাণ্ড যোগসূত্র আবিষ্কার করে নিশ্চিন্ত মনে সেই সূত্র ধরে অগ্রসর হচ্ছেন।

নায়িকা রেণু এ খেলায় কেবল মাতার হাতের ক্রীড়নক হ'য়ে ছিল না। তারও প্রচেষ্টা ছিল আরাধ্য দেবের অন্যবিধ পূজার ব্যবস্থা করা। সুতরাং মাতাপুত্রীর উদ্যমে আমরা সাফল্যলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

কিন্তু, একদিন সহসা বজ্রপাত হ'ল। জাতি ও ধর্ম্মে অকস্মাৎ সতীশের প্রবল আস্থা দেখা গেল। সতীশ জানাল কুলগৌরব বিসর্জ্জন দিয়ে তার পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব নয়। "তবে কেন তুমি রেণুর সঙ্গে এতদিন ধরে এ ভাবে মেলামেশা করলে?"—মিলামাসী প্রশ্নের উত্তর পান নি।

অনেকদিন রেণুদের বাড়ী যেতে পারি নি, কাজেই সতীশের প্রত্যাখ্যান রেণু কি ভাবে গ্রহণ করেছে আমার জানা ছিল না। তবে সামাজিক জগতের চাপাকণ্ঠে শোনা যেত, রেণু বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েনি, বরঞ্চ দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন মৃগয়ার সন্ধানে বের হয়েছে। রেণুর হৃদয় নেই, রেণুর লজ্জা নেই।

মিলামাসীর ফটকের সামনে গাড়ী থামল। গাড়ী থেকে

নেমে দরজা খুলে ধরে বল্লাম, "আজ ভেতরে যাবনা, মাসীমা। রেণুকে বলবেন। বেশীক্ষণ বাইরে থাকলে খুকুর ঠাণ্ডা লাগবে।"

"সেকি অনুভা, বাড়ীর দরজা থেকে ফিরে যাবে?" মৃদু আপত্তি তুলে অবশেষে মিলামাসী অন্দরের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি গাড়ীতে উঠে বসলাম।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ খুকুর আব্দার আরম্ভ হ'ল, "মা, ফুল নেব। লাল ফুল নেব। ওই যে ওই লাল ফুল।"

রেণুদের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে অজস্র কৃষ্ণচূড়া ফুটে আছে, খুকুর লক্ষ্য সেই দিকে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামতে হ'ল আবার। ফুল সংগ্রহ করে ফেরবার মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম। দম দেওয়া যন্ত্রের একঘেয়ে একাগ্রতায় কার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অবিরাম বাক্যবিন্যাস আমার কর্ণে এল?

মিলামাসীর বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। কয়েকটি সুবেশ যুবক পরিবৃত হয়ে রেণু বসে আছে। গলার স্বর তারই বলে মনে হ'ল। ভালো করে একটু দেখতে যেয়ে রেণুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

"অনুভাদি! এস, এস। মাকে বুঝি তুমিই নামিয়ে দিলে?" লাল ভেলভেটের জুতোতে পাথরের মেজেতে ঝঙ্কার তুলে গাঢ়সুনীলবসনা রেণু বসবার ঘর থেকে দ্রুতধাবনে বেরিয়ে এল। গায়ে তার হাতকাটা লাল কিংখাবের জামা, শুভ্র তনু যেন

ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্দ্ধ অনাবৃত। জরির ফিতেয় বেণী দুলছে। অধর রক্তবর্ণে রঞ্জিত, কপোল আবীরলাল। রেণু এক হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল,—“একযুগ পরে তোমাকে দেখলাম।”

আমার কিন্তু কেন জানিনা মনে হ'ল এই অতিসজ্জিতা, কথার তুবড়ী মেয়েটিকে আমি চিনি না।

খুকুর হাতে ফুল দিয়ে রেণুর নখর রমণীয় হাতখানা সন্তর্পনে ধরে বল্লাম, “হ্যাঁ, অনেকদিন পরে দেখা হ'ল। ভেবেছিলাম কাল তটিনীদির পার্টিতে যাব, সকলের সঙ্গেই দেখা হবে। যেতে কিছুতেই পারলাম না খুকুকে ফেলে। তুই তো গিয়েছিলি, না?”

“ওঃ, না যেয়ে রক্ষা আছে? যে ভয়ানক লোক তটিনী ঘোষ, টেনে নিয়ে গেল সবাইকে। ভদ্রমহিলা যেন কি রকম! ভয়ানক নিন্দুক, ভয়ানক খারাপ লোক—”

আমি রেণুর অসংখ্য বাক্যাবলী ও অবিরাম হাতনাড়া দেখছিলাম। আগে তার মধ্যে একটা শান্ত-সমাহিত ভাব দেখেছি। কথা সে বলত খুবই কম, বলবার ভঙ্গীও অন্য রকম ছিল। সাজসজ্জায় তার যে রুচি ছিল, সে রুচিও এত প্রখর ছিল না। এ তো বিলাসসজ্জা নয়, যুদ্ধ সাজ!

“কি যে যাচ্ছেতাই কাণ্ড সব কাল হয়েছে পার্টিতে, কি বলব অনুভাদি!” রেণু কোমরে হাত দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে এঁকেবেঁকে হাসতে লাগল,—“আইসক্রীমটা নষ্ট করল একটা

বাক্সে গন্ধ দিয়ে। She is mean, গোকুলপিঠে গড়েছে যেন বাতাসে উড়ে যাবে। মিষ্টার রায়, ওই যে গো আই-সি-এস রায়, আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি তো গোকুলপিঠে দেখে হাসতে হাসতে বিষম খেলেন। ইস্, এই সমস্ত মহিলারা! বিয়ে করে সব পছন্দ হারিয়ে বসে আছে—" দ্রুত উত্তেজিত ভঙ্গিতে রেণু অবিশ্রান্ত কথা বলে যেতে লাগল, যেন কথা না বলে তার শান্তি নেই, যেন তার পেছনে মৃত কেইনের অশান্ত আত্মা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে—কথা তার বলতেই হ'বে।

গলার স্বর অন্তরঙ্গ করে রেণু নূতন দফা আরম্ভ করল—"সবাই সমান। এই মিষ্টার রায়টি কি সোজা লোক? আমার পিছনে পিছনে জোঁকের মত লেগেই রইলেন। আমি অবশ্য আমল দিলাম না। ও লোকটাকে আমার জানা নেই!" আশ্চর্য্য, এত কথা দিয়ে রেণু কি বলতে চায়? প্রতিটি পরিচিত ব্যক্তির অহেতুক নিন্দা করে, অজস্র কথার প্রবাহে নিজের প্রাণশক্তি ব্যয় করে তার কি লাভ হচ্ছে? এত কথা কেন বলে ও আজকাল!

কেন জানি না একটি অস্বাভাবিক ইচ্ছা অদম্য হয়ে উঠল। যেন অবচেতন মন অন্তরাল থেকে সহসা নির্দ্দেশ পাঠাল। প্রশ্ন করে বসলাম, "রেণু, সতীশের খবর কি?"

পলকে রেণুর কথার লহরী স্তব্ধ হয়ে গেল। কঠিন, বিবর্ণ

মুখে অসহায় আতঙ্ক প্রতিফলিত হল। মুহূর্ত্তের জন্য রেণু যেন স্কন্ধারূঢ় কেইনের অশান্ত আত্মার মুখোমুখী দাঁড়াল।

এক মিনিট মাত্র। আবার প্রেতস্বস্তয়নের অর্থহীন মন্ত্র আরম্ভ হয়ে গেল—"O that cad! জানিনা। কোন খবর রাখি না, রাখতেও চাই না। লোকের কাছে বলে বেড়ায়, আমি নাকি ওকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছিলাম! আমার দায় পড়েছিল। আর কি লোক ছিলনা?"

রেণু কত কি বলে যেতে লাগল। আমার কিন্তু কেবলই মনে হ'তে লাগল—আশ্চর্য্য! রেণু এত কথাও বলতে শিখেছে! আর রেণুর সমস্ত বিদ্বেষ ও বাক্যজাল ভেদ করে চোখের সম্মুখে ফুটে উঠতে লাগল, একদিন অতর্কিতভাবে সতীশের বাহুবন্ধনে রেণুর যে আত্মসমর্পণের নিবিড়তা দেখেছিলাম, সেই ছবিখানি।

"শুভরাত্রি, অম্বুভাদি।" পাশ্চাত্যপ্রথায় অভিবাদন করে রেণু সান্ধ্যআসরে ফিরে গেল। আমার গাড়ীও বাড়ীর পথে চলল।

নরম কুশানে হেলান দিয়ে ভাবলাম: রেণুর সত্যই হৃদয় নেই। নাঃ, আজ খুকুর বাবার কাছে হার হ'ল। আধুনিক মেয়েরা ভালবাসার কোনই মূল্য দেয় না। ছয়মাসের মধ্যে প্রেমিকের স্মৃতি মুছে ফেলে দিতে পারে। রেণুর নির্লজ্জ বেশভূষা, পরচর্চ্চা ও নবাগত সঙ্গীবৃন্দের কথা আবার মনে মনে ভেবে দেখলাম। রেণুর মন এত হাল্কা, ছি! কি বাজে কথা বলে!

সহসা একমিনিটের জন্য দেখা রেণুর কঠিন-বিবর্ণ মুখচ্ছবি মনে পড়ে গেল। অসহায় আতঙ্কের ছায়া সে মুখে। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে কথা সে বলে যাচ্ছে, যেন কে তাকে কথা বলাচ্ছে !

দিবালোকের সুস্পষ্টতায় সংশয়ের কুয়াশা কেটে যেয়ে চরম সত্য আমার কাছে প্রতিভাত হ'ল—

রেণু কথা দিয়ে ব্যথা ঢাকতে চায়। রেণু ভুলে থেকে বাঁচতে চায়।

বর্ষণ এল মনে ?

চমৎকার একটি বৃষ্টির গল্প লেখা যাবে—জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে মাধবী বাগচী ভাবল। জলের ছাঁট বইগুলো ভিজে গেছে টেবিলের। কেমন তেরছা ধারায় মিছরির বৃষ্টির মত বৃষ্টি পড়ে! আঃ, কি বর্ষার পটভূমিকা! পাশের বাড়ীর লনের ওপর দিয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তাদের বাড়ীর সামনে পিচে কলঙ্কিত পথ জলস্রোতে অদৃশ্য। রাস্তার পাশে কর্পোরেশন ফুলের গাছ বুনে বুনে নিজের রুচিবোধের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে। অধিকাংশ গাছেই ভাগ্যক্রমে ফুল ফোটেনি। কলিকাতা নগরীতে মালবিকার দল আর নেই এখন! ফুল ফুটবে কি করে? কিন্তু দুই-একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছে ফুলে ফুলে যেন অগ্ন্যুৎসব আরম্ভ হয়েছে। সেই উজ্জ্বল রং জীবনযাত্রার বর্ণহীনতায় বেমানান। কৃষ্ণচূড়াগাছ জলে ভিজছে, রংয়ের ঔজ্জ্বল্য তাদের আজ কিছু ম্লান; বন্ধু সূর্য্যের সোনা দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠেছে কিনা। যা সোনার বাজার! গাছগুলো কি সবুজ দেখাচ্ছে নীলাভ ধূসর বৃষ্টির মেঘের তলায়! কি সুন্দর পটভূমিকা একটি বৃষ্টির গল্প লিখবার— মাধবী বাগচী ভাবল।

হ্যাঁ, একটা লেখা প্রয়োজন। 'বাঁশরী' পত্রিকা থেকে তিন বার তাগিদ এসেছে। আর পাঁচদিনের মধ্যে লেখা চাই। উঃ,

কি করে পাঁচদিনের মধ্যে গল্প লেখা চলে ? সব উৎস তো শেষ হয়েছে। কি নিয়ে লিখি ? এপাশের জানালাটা খুলে মাধবী জানালার ধারে বসল। এধার দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে না।

এই বৃষ্টি। কি পুরাতন! পৃথিবীর মত প্রাচীন। ছোট মাধবীর কাজলটানা নির্ব্বোধ চক্ষুর পলকের সামনে ঝরেছে। কোন অর্থ ছিল না তখন। কেবল ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া আর ভিজে বাড়ীর অস্বস্তিকর অনুভূতি। কৈশোরে বৃষ্টি আসত নানা খাদ্যের সূচনা বহন করে। এক্ষুনি খিচুড়ি উঠবে উনুনে, হয়তো পরিবারের কেউ কর্ম্মস্থল থেকে ফেরবার পথে একটা গঙ্গার ইলিশ নিয়ে আসবে। কাপে কাপে চা অসময়ে রান্নাঘরে প্রস্তুত হচ্ছে। বেগুনী-মুড়ি-চিঁড়েভাজা। মাধবীর বাড়ীর ছাদে বৃষ্টির নাচ যেন কথা বলে যেত : 'পিতলের গামলায় কড়াইসুঁটি খুলে রাখ।' উতলা বাতাসে রন্ধনশালার আঘ্রাণ ভেসে আসত ; কচুরীর স্বাদ জাগত জিহ্বায়। তারপর যৌবনে বৃষ্টি। আহা, যেন কত অলিখিত কবিতা পাঠ হচ্ছে বৃষ্টির ঝরঝরে ! কত বিরহ-মিলন গুঞ্জন করে ওঠে সিক্ত অন্ধকারে। কত সম্ভোগের স্মৃতি সহসা আকুল করে তোলে, অসহ্য লাগে পৃথিবীর মুখের ওপর জলবিন্দুর আবরণ। আদিম প্রবৃত্তি জাগে বক্ষে। যৌবনের মাদকতাময় বর্ষাধারা !

বৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে মাধবী ভাবল, সেই পুরনো বৃষ্টিকে কাঠামো ধরে প্রতিমা স্থাপনা করি। তার আগে কতকগুলো

চিঠি লেখা প্রয়োজন—টাকার তাগিদ দিয়ে প্রকাশক ও পত্রিকার স্বত্বাধিকারীদের। কিন্তু এমন মোহময় বর্ষা সহজে আসে না। এমন পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ বর্ষা। সুতরাং, আজ কাজ থাক। তা'ছাড়া, বর্ষা নিয়ে গল্প যখন লিখতে হবে তখন সেই বর্ষাকে দেখি একটু চোখ মেলে। মাধবী বাইরে তাকাল। জলের ধারা পড়ছে যেন মুক্তাধারা। আচ্ছা, এই উপমাটা তো সবাই লাগায় জায়গা—মাফিক। নূতন কিছু তো দেখি না। মণি কর্ম্মকার বোধহয় একশোটি বর্ষার গল্প লিখেছে, সব ক'টায় ওই জরাজীর্ণ মুক্তা-ধারার উপমা। আমিও তো লিখেছি, গোটা-তিনেক! একটাতে আছে নুড়ি গড়িয়ে ফেলার উপমা, আর একটা—মনে করবার চেষ্টা করল মাধবী।

কিন্তু, সত্যই ওরা মুক্তা নয় কি? লিখে এদেশে টাকা পাওয়া যায় না। যাও-বা দেয়, তাতেও আবার তাগিদ দিতে হয়। এতে মনে অহেতুক একটা চাপ পড়ে, শিল্পীর পক্ষে সেটি ক্ষতিকারক। এই তো 'প্রভাকর' কাগজ, চিঠিটা আজকাল করে করে চক্ষুলজ্জায় লেখা হচ্ছে না। যারা জিনিষ নিয়ে দাম দেয় না, লজ্জা তো তাদেরি হওয়া উচিত। এই চক্ষুলজ্জাই তো কাল হ'ল মাধবীর। পেশাদার লেখকের মত অগ্রিম মূল্য সে চেয়ে উঠতে পারে না, ঝকাঝকি করতে পারে না। সুবিধা নেয় সকলে। বাজারের লাউ-কুমড়োর মত গল্প-কবিতার দরাদরি করতে বাধে তার। সত্যি, চিঠিটা লেখা উচিত। বোকা

মেয়ে! বৃষ্টির ধারায় মুক্তা গুণে মুক্তা না পরার আক্ষেপ মেটাও লেখকেরা।

কিন্তু, এই ব্যবসা-সংক্রান্ত কথা নিয়ে মনে মনে আলোচনার সময় কি আজ? সেজন্য প্রখর এবং উত্তপ্ত সূর্য্যালোক পড়ে আছে। আজ চেয়ে দেখ, গদ্য-কবিতার অঙ্গে গীতিকাব্যের জোয়ার লেগেছে। ইট-কাঠের খাঁচাতে এসেছে রামগিরি আশ্রমের আষাঢ়। মনকে অন্ততঃ কিছুটা সঞ্চয় দাও আজ, মাধবী বাগচী। নইলে ও মনের যে পাঠককে নূতন কিছু দেবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যাবে। তোমার সহকর্ম্মী অন্যান্য সাহিত্যিকের মত তুমিও যে পুরাতন মালের ব্যবসা চালাতে আরম্ভ করবে, মাধবী বাগচী। সুতরাং, কিছুক্ষণের জন্যও ভোল, ব্যবসার কথা ভোল।

ইস্কুলে-পড়ুয়া ছেলের নিরানন্দ মনোযোগ নিয়ে মাধবী আবার বৃষ্টি দেখতে আরম্ভ করল। জীবন কি সৌন্দর্য্যশূন্য হয়ে গেল দেখতে দেখতে! এই কি সাহিত্যিক জীবন? যে জীবনের মিথ্যা গরিমার স্বপ্নে মাধবীর কৈশোর দিনগুলি তন্ময় হয়ে থাকত। আজ বহুদিনের কামনা মিটেছে তার। কিন্তু কি পেয়েছে সে? সভা-সমিতিতে অত্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর অনুষ্ঠান দেখা। রেডিও-যন্ত্রের সম্মুখে মুখ নিয়ে তারস্বরে জগতকে শোনানো নারীত্বের আদর্শ কি। যেন ওসব কথা শোনে কেউ। যেন ওতে কারও কিছু আসে-যায়! কলম ধরে, পেছনে সময়ের প্রেতমূর্ত্তির তাড়া খেয়ে ক্রমাগত লেখা—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ,

নাটক। তারপরে তাই নিয়ে মন-কষাকষি, উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার বিরক্তি, অযোগ্য সমালোচনা শোনার গ্লানি। ওসব লেখার মানে কি? মাসে মাসে হাজারখানা কাগজ বা'র হয়, তাতে যার খুসী তার লেখা দিয়ে ভরালেই হ'ল। কে-ই বা পড়ে, কে-ই বা বোঝে? তারপরে চিঠিলেখা, আলাপ করা, লেখা শোনানো ও শোনা, টেলিফোন ধরা ও নিজের স্বার্থসম্বন্ধীয় ব্যাপারে চোখরাখা। চব্বিশ ঘণ্টাতে আর সময় কোথায়? যদি এতগুলি দাবী মেটানো সম্ভবপর হয়, তবে হয়তো একদা দয়াধর্ম্ম করে সবজান্তা বাংলাভাষাকার তোমার বিষয়ে তাঁর কোন একখানা ভুলত্রুটি-কলঙ্কিত অখ্যাত বইতে লিখবেন : 'মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীমতী মাধবী বাগচীর নাম উল্লেখযোগ্য। লেখিকা গল্প বলিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহার ভাষাও ভাল।' শত ধিক্ সাহিত্যিক জীবনে!

থাক, বাইরে দেখ বর্ষার সমারোহ। রাজ্যজয় হচ্ছে যেন। এই বর্ষা বহুদিন পরে এমন করে গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি এসেছে মাধবীর। এই প্রবৃত্তির সুযোগ নেবে সে।

থোকা আঙুরের মত শ্যাম-চিক্কণ মেঘ, যেন হাতে করে অধরে চেপে ভালবাসতে সাধ হয়। কি সুন্দর উপমাটি মাথায় এল! একে হারানো চলবে না। এই বর্ষার পটভূমিকায় গল্পটি লেখা শেষ হলেই আর একখানা গল্পের বই প্রকাশিত করা চলে। অথবা প্রবন্ধ-সংগ্রহ?

আশ্চর্য্য প্রকৃতি! নিজের অধিকার সে কলিকাতা সহরেও হারাতে রাজী নয়। তাই মাঝে মাঝে এমনি বর্ষাদিন ডেকে আনে, দেখিয়ে দেয় প্রতিদিনের যন্ত্রসভ্যতার নীরস নগরীকেও রূপান্তরিত করা চলে।

সমস্ত লেখা ছড়িয়ে আছে। এক করে না রাখলে হারিয়ে যেতে পারে। থাকগে, ওর মূল্য কি? কতকগুলো কাগজ ছাপাখানায় আটক করা। মনকে টেনে আনি ওসব থেকে।

কি শব্দ—ঝমঝম! তরুণী ছাত্রীর অবিরত উৎসাহে গলা-সাধা। মন্দ কথাটা তো নয়! বসিয়ে দেব। বহু যুগের প্রচলিত বর্ষাদিনের বর্ণনা দিতে হ'লে নূতন কথা চাই। এই নিরালা মুহূর্ত্তে, এমন নির্নিমেষ দেখায় সুন্দর কাহিনী ফুটে উঠবে একটি।

সজাগ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিপাশ দেখল মাধবী। পাশের বাড়ীর গাড়ীবারান্দার নর্দ্দমার সিংহমুখ জল ফেলছে নীচের পাতাবাহারে। চক্‌চক্‌ করছে ধোয়া চওড়া পাতা—ধোবার বাড়ীর ইস্ত্রি-করা রঙীন শাড়ীর মত। দু'পাশে লন্‌ ঘিরে দুটী নুড়ির লাল-শাদা পথ, জলে নিমগ্ন। মাধবীদের বাড়ীর একপাশে ক্যানা ফুটেছে লাল চেলির রংয়ে। তাতে হাত পা আটকিয়ে একটা মুমূর্ষু প্রজাপতি জলের তোড়ে আত্মরক্ষা করে ভেসে আছে এখনও। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাল মাধবী। কি প্রয়োজন জীবনযুদ্ধের, বন্ধু? হাত পা খুলে ছেড়ে দাও, আত্মসমর্পণ কর।

হলুদ-কাল ডানার রং তো তোমার জলে ধুয়েই গেছে, বিগতশ্রী হয়ে সংক্ষিপ্ত জীবন একটু বাড়িয়ে চলার প্রয়োজন কি? জীবনের মোহ কি এতই বেশী? তুমি বাতিল হয়ে গেছ আধুনিক জগতে। যে সাহিত্যিক তোমাকে নিয়ে সৃষ্টিকাজ করবে, প্রজাপতি, তার সময় কোথায়? সে তখন মাসে পাঁচটা গল্প, দশটা কবিতা, চারটে প্রবন্ধের প্রোডাকশন্ প্লাস ধরাধরি, ঘোরাঘুরি নিয়ে ব্যস্ত। তোমাকে চেয়ে দেখবার সময় তার নেই। তুমি তার কাছে দাবার ঘুঁটী, একটা ছকে প্রয়োজনমত বসিয়ে দেবে! সুতরাং অভিমানে বিদায় নাও।

আমার সেই পুরণো মন কোথায়? কি যেন নেই? এই বর্ষার দিনের সঙ্গে আর তো আমি এক হয়ে মিলে-মিশে যেতে পারছি না। যেন পৃথকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে দর্শকের দৃষ্টিতে দেখছি আমি। আগে দুইবিন্দু জল গায়ে লাগলে ময়ূরের পুলক দেখা দিত। আজ এ বর্ষায় আমার মনে সাড়া নেই কেন?

আকাশের দিকে তাকাল মাধবী। বৃষ্টির বেগ কিছু কমেছে। হাল্কানীল আকাশের রং কেমন? ঠিক তার মায়ের আলমারীতে তুলে রাখা কাল চওড়াপাড় প্রাচীন সিমলেশাড়ীর আবেশ লাগানো স্বপ্নের দেশের হাল্কানীলের মত। কিন্তু, তা তো লেখা চলে না—মেঘ মায়েঁর আলমারীর পুরণো সিমলেশাড়ীর রংয়ের। অন্য কোন বিশেষণ চাই লেখার জন্য।

লেখার জন্য কেন? সে তো কেবল বর্ষা দেখছে। তবে?

হায় মাধবী বাগচী, তুমি তো দেখছ না, তুমি লিখছো মনে মনে। কাগজে-কলমে নয়, মাত্র এইটুকু প্রভেদ। এই বর্ষার দিনের দৃশ্যকাব্য তুমি কেবল চর্ম্মচক্ষু দিয়ে দেখে যাচ্ছ, মন তোমার প্রত্যেকটি অনুভূতি ভাষায় অনুবাদ করে ফেলছে পাকা লিখিয়ের নির্ভুলতায়। তাই তুমি শুধু দেখে তৃপ্ত থাকছ না, দেখাকে বিশ্লেষণ করছ কথা দিয়ে, দার্শনিকতার বোলচাল প্রলেপ দিচ্ছ তার ওপরে। মাধবী মাধবী, এ বর্ষার দিন তোমার কাছে একটা গল্প লিখবার কাঠামো মাত্র। তাই মনে মাদকতা আসছে না। সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন আজ ছাপালেখার নীচে হারিয়ে গেছে।

কিসের আশায় কি দিলে, মাধবী? 'Selling one's birthright for a mess of pottage', না? যে সাহিত্যিকদের এতক্ষণ নিন্দা করলে, তুমিও যে তাদেরই দলে। হায়, মাধবী বাগচী, তুমি যে পেশাদার লেখক বনে গেছ।

তিনটি দিন

(প্রথম দিন)

'কি পাওয়া যাবে? আমার পক্ষে আর কি পাওয়া যেতে পারে!'

ছুটে চলেছে ট্রেন বি-এন্-আর লাইনে। জামশেদপুরে এ যাত্রার অবসান, কবিবর্ণিত অনির্দ্দিষ্ট অসীমে নয়। দুইচারিজন যাত্রী মাত্র মহিলা-কক্ষে। শিশু না থাকায় কলহ-কাকলী নেই। যে যার নিজস্ব চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত।

'কি পাওয়া যাবে? কি আর পেতে পারি!' সমগ্র গাড়ীটির ক্ষুদ্র পরিধি আচ্ছন্ন করে মধুপগুঞ্জনের ক্ষীণ ঝঙ্কারে নৈরাশ্য ও হতাশার বাণী ফিরে বেড়াচ্ছে, 'কি পাওয়া যাবে?'

দরজার সামনে বেঞ্চে বসে আছেন দুইটি বিগতযৌবনা মহিলা। একজনের রুক্ষ মুখভাব, অসজ্জিত কেশগুচ্ছ, চশমাবদ্ধ নয়ন, হাতের বৃহৎ ও প্রাচীন কালো হাতব্যাগ—সমস্তই দেখে মনে হয় সুকুমারমতি বালিকাদের নীরস বিদ্যালয়ে তাড়না করার অভ্যাস ওঁর জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখ কি ওঁরই? সীমানিবদ্ধ আশাশূন্য জীবন, কোথাও দিনান্তের প্রশান্ত লাবণ্য সঞ্চিত হয়ে নেই। আছে নিঃসঙ্গ হৃদয়ের গভীর ক্লান্তি। পার্শ্ব-

বৰ্ত্তিনী স্থূলা প্রৌঢ়া ; দেহে অলঙ্কারবাহুল্য, শাড়ীর চওড়া জরিপাড় তাঁর পার্থিব সম্পদের নির্দ্দেশ দিচ্ছে। মুখের ভাব-লেশহীন নির্লিপ্ততা দেখে সুখের আভাস পাওয়া শক্ত। তবে কি এমন কোন বেদনা এঁর জীবনে আছে, যে বেদনা নীরবে সহ্য করা ভিন্ন গতি নেই ?

'কি পাওয়া যেতে পারে ?' শুনছি নিবিড় হতাশার আক্ষেপ। আমার বিধির শ্রবনে অর্দ্ধেক ধরা দিয়েছে, অর্দ্ধেক ধরা দিয়েছে আমার প্রভাশূন্য নেত্র-তারকায়। ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝবার অনুভূতি নয়, অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করবার। বুঝেছি, জেনেছি এই কামরায় অসুখী কেউ আছে ; তারই নিঃশব্দ—উচ্চারিত মূক ক্রন্দন বাতাস আচ্ছন্ন করে অশরীরি-প্রেতের ব্যগ্রতায় ভ্রমণ করছে। কিন্তু, সে কে ? কে সে ?

মধ্যের বেঞ্চে বসেছেন বিধবা রমণীটি। অলঙ্কারবিহীন মণিবন্ধ, পাড়ছাড়া কাপড় দুর্ভাগ্যকে আপনি ধরিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত জীবনের নিদারুণ একাকীত্ব বহন করার দুঃখ আছে, সন্দেহ নেই।

তাঁর পাশে দুইটি চিন্তাকুলা কিশোরী। প্রথম প্রেমের বেদনা নিশ্চয়। 'আমি আর কি পাব ?'—আবার শুনলাম, বুঝলাম সেই আর্ত্তস্বর !

তৃতীয় বেঞ্চের বিবাহিতা তরুণী এত বিমনা কেন ? কঠিন দুঃখের ছাপে মলিন তাঁর মূর্ত্তি। স্বামীর কাছ থেকে তিনি বড় আঘাত পেয়েছেন বোধ হয়। অবিশ্বাস কি ?

তাঁর পাশের তরুণীর দেহলাবণ্যকে বর্দ্ধিত করেছে সজ্জানৈপুণ্য। রক্ত-অধরে হাসি তার দেখা দিয়েই আছে, কৃষ্ণ নয়নে চাঞ্চল্য। এ কি অসুখী হ'তে পারে ?

'কি পাব ? আর কি পাব ?' আবার ভ্রমরগুঞ্জনের বৈচিত্র্যহীন একাগ্রতায় কার অসুখী মন রেল-কামরার জীর্ণবিবর্ণ লৌহে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ? কেউ এর মধ্যে কি এত দুঃখ অনুভব করছে ? নিশ্চয় করছে, নইলে এই হতাশা, এই ক্রন্দন স্পন্দিত হয়ে উঠছে কেন ? কে সে ? সে কে ?

সকলেরি গোপন জীবন আমি জানি, আমি দেখতে পাই। আমি এবং আমার মত যাঁরা কলম হাতে ধরেছেন, আমরা সকলে যে অন্তর্য্যামী ! সুতরাং বিচারের ভার তোমরা নিও না। আমার ওপরে ছেড়ে দাও। চোখে দেখার প্রত্যক্ষ জগতের বাহিরে যে আরও একটি জগৎ আছে, তার সন্ধান আমি তোমাদের দেব।

শিক্ষয়িত্রীর মনে আনন্দ। সহকর্ম্মিনীর নামে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে লাগিয়ে তাঁকে পদচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তাইতে আনন্দ তাঁর চিত্তে।

প্রৌঢ়ার মনে আশা। এক সংসার থেকে অন্য সংসারে যাচ্ছেন তিনি পরম সমাদরে আমন্ত্রিত হয়ে। এক ছেলের সংসার গুছিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় ছেলের সংসারে যাচ্ছেন। পাশের কামরায় তাঁর স্বামীও চলেছেন।

বিধবা শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে চলেছেন—হতাশার আক্ষেপ নয়। তীর্থ দেখে, গুরু-স্বীকরণ করে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে ফিরছেন তিনি।

ছাত্রীদুটি আসন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার ছাত্রী; গণিতশাস্ত্রে উভয়েই গৌরীশঙ্কর বিশেষ। তাই চিন্তার অবধি নেই। তুচ্ছ আতঙ্ক তাদের—এ নৈরাশ্য ধারণারও অতীত।

তবে ওই তরুণীই অসুখী—এ বিষয়ে সংশয় নেই। অমন বিষণ্ণ মুখভাব, ছলছল নয়ন দুঃখভিন্ন দেখা যায় না। তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি—উনি দুঃখিত। কিন্তু, ভুল কোরনা। দুঃখ ওঁর নিজের নয়। অন্যের দুঃখে উনি দুঃখিত। তা'হলে শেষ ব্যক্তিটির দিকেই দেখা যাক। সিল্ক-ব্রোকেটের সোনালী জামা, সোনালী ভয়েলের শাড়ী, পায়ে সোনালী সোয়েডের জুতো, হাতে সোনালী ভেলভেটের হাতব্যাগ। সে হাসছে মৃদু হাসি, একহাত অলসভাবে জানালার উপরে রক্ষিত, অন্যহস্তে ব্যাগটি ধরে আছে। পায়ের জুতো কাঠের মেজেতে ঈষৎ আঘাত করছে—যেন তার হৃদয়োত্থিত কোন সুখসঞ্চরণের সঙ্গে। কালো চোখে অপার কৌতূহল সহযাত্রিণীদের প্রতি। অত হাসি যার, অত মনোযোগ যার, সে কখনই অসুখী নয়। বিবাহিতা তরুণী এরই সহোদরা। বোনের দুঃখে আজ তাঁর সুখ নেই, আমি জানি। যার জন্য অন্যের দুঃখ, তার কি করে সুখ থাকতে পারে?

তোমরা না বুঝলেও আমি বুঝি। দুঃখ যার—তারই যে

সুখের অভিনয় করতে হয়। অত সুনিপুণ প্রসাধনে অন্যের চক্ষু থেকে আহত হৃদয়কে লুকিয়ে রাখতে হয়। মুখের হাসি দিয়ে বুকের ব্যথা তুমি বেশ ঢাকতে শিখেছ, সুমনা, আজ তুমি ধরা পড়ে গেলে সুখের আড়ম্বর অতিরিক্ত দেখাতে যেয়ে।

সুমনা, তোমার গল্প আমি সকলকে বলে দিচ্ছি। মাতা পিতা নেই তোমার, ধনী ভ্রাতার গৃহে তুমি পালিতা। সে সংসারে তোমার আদর আছে, জোর নেই।

দাদার সুযোগ্য শ্যালক বিজয়কে ভালবেসেছিলে তুমি। বহুদিনের আলাপ, তোমার ন্যাকা বউদি এ ভালবাসার প্রশ্রয় দিয়েছিল! তারপর যোগ্যতরা পাত্রী যুটলে সে প্রশ্রয় হ'ল প্রত্যাখ্যান। স্ত্রৈণ দাদা কিছু বল্লেন না। বিজয়ের বিবাহ অন্যত্র স্থির হয়ে গেল। বিজয়! তার নাম করলে, আজও সুমনা, তোমার মন বাসনা-বেদনায় আলোড়িত হয়ে ওঠে।

বিজয়ের বিবাহের এখনও বিলম্ব আছে। কিন্তু সে যে তোমাদের বাড়ী আসা, তোমার সঙ্গে মেশা ত্যাগ করছে না। বড় বিপদে পড়েছ তুমি, সুমনা। পরম দুঃখের উপর চরম পরীক্ষা তোমার হয়েছে। হৃদয়াবেগকে গোপন রেখে দূরে সরে থাকবার উপায় নেই তোমার। ভয় হয়, বিজয়কে দেখে তার কণ্ঠালিঙ্গন করে করুণাভিক্ষা চেয়ে ফেলবে, নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারবে না। ভয় হয়, কি করে তুমি সহ্য করবে, কি হবে তোমার!

দিদি তিনদিনের জন্য জেমসেদপুরে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছেন। নিজের বোন! তার উপরে এত অবিচার করা হয়েছে! সুমনাকে অন্ততঃ তিনদিনের জন্যও শান্তি দিতে তিনি নিয়েছেন সঙ্গে।

বসন্ত এসেছে। কোথাও বহুদূরে বসন্ত এসেছে। মনে হয়, জীবনে দক্ষিণাবাতাস আর লাগবে না। চুরোটের ধোঁয়ার মত কুণ্ডলীকৃত সাদা ধোঁয়া উড়ছে এঞ্জিনের নলে। পলাশের বর্ণ-বিহ্বল পথপার্শ্বের বনভূমি। সুমনা বাহিরে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমি জানি দৃষ্টিতে তার সমস্ত কিছুই অর্থহীন। কলিকাতা সুমনার জন্য বক্ষে ধরে আছে বিরাট ব্যথা। তবু কলিকাতা ছেড়ে যেতে মনের প্রান্তে টান লাগে। মনের মধ্যে বিদায়-গীতি বেজে ওঠে। তার প্রেমের প্রতীক যেন এই ইটের নগরী। কোথায় চলে যাচ্ছে সে? কিছু কি তার সেখানে পাবার আছে? জীবনে সমস্ত প্রয়োজনই তার যে শেষ হয়ে গেছে।

আশার ইঙ্গিত তবু যেন দেখা যায়। মনে হয়, এই যাত্রা তার শেষ হ'বে না বিফলতায়। আশ্চর্য্য মানুষের মন! গত সন্ধ্যায়ই মনে হয়েছিল এখনও মৃত্যু আসছে না কেন! আজ অপরাহ্নে ট্রেনের কামরায় বসে মনে হচ্ছে কিছু পেতে যাচ্ছে সে।

সুমনা, এইখানে আমি তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছি

তোমাকে পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে। তুমি কি পেতে পার আমি বুঝেছি। একটি দিনই আমার বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে, সাধারণ পাঠক এবং তোমার নিজের প্রয়োজন তিনটি দিনের। তাই পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে আমি এ আখ্যায়িকা থেকে বিদায় নিলাম, সুমনা।

(দ্বিতীয় দিন)

ইদারার ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালতে ঢালতে সুমনা চারিদিকে চেয়ে দেখল। না, জামাইবাবুর বন্ধুর বাড়ীটি সুন্দর হ'লেও বাগানের অবস্থা সুবিধার নয়। এমন সুন্দর বাড়ী অথচ গাছ-পালা নেই। একটি মাইনে-করা রক্ষক আছে, কিন্তু মালিকের নিয়মিত আসা-যাওয়ার অভাবে এই দশা। এইখানে কয়েকটি রজনীগন্ধার ঝাড় দিলে বেশ শোভন দেখাবে, পাশে চায়না রোজ। স্থানীয় নার্শারীতে খোঁজ করলেই চারা গাছ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেন? কার বাগান কে সাজাবে? "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।"—সত্য, তার উদ্যান-নির্ম্মাণ শেষ হয়ে গেছে।

মনের মধ্যে খালি লাগে। মনে হয় বিশাল পৃথিবীতে কোন এমন সূত্র নেই, যা অবলম্বন করে সে আশ্রয় পাবে, সে সহজ পথে ফিরে যাবে। ত্রিশঙ্কুর মত নিরালম্ব শূন্যে কি তার বাকী জীবন কাটবে! গোলকধাঁধাতে ঘুরে ঘুরে পথ

পাওয়া যায় না। কোথায় প্রাচীন গ্রীসে কোন পুষ্পসন্নিভা রাজপুত্রী নির্ব্বাসিত রাজকুমারকে একটি সূত্র নিক্ষেপ করে গোলকধাঁধার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল! সে সূত্র প্রেমের— ভীনাসের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে ধন্য হয়েছিল সেই মিলন। আমার জীবনে কোথায় প্রেম? কোথায় অপরূপ বর্ণসম্ভারে বিকশিত প্রেমপদ্ম? আমার ভাগ্যে তাই গোলকধাঁধায় ঘুরে মরা সার হ'বে। প্রেমের রশ্মিপাতে কেউ আমাকে পথ বলে দেবেনা।

তবু ফাল্গুনের আকাশে কি মাদকতা! সূর্য্যের আলো যেন অঙ্গুলি প্রসারণ করে সুখের পথ দেখিয়ে দিতে চাইছে। আকাশে স্বচ্ছ মেঘের সঙ্গে আনন্দবারতা ভেসে বেড়াচ্ছে। কি যেন একটা আছে, সেই আশ্রয়ে এখনও দিন নূতন নির্দ্দেশ খুঁজে পাবে।

'আমার আর কি হ'বে? কি পাওয়া যাবে?' সুমনা কল্পনাকে অসম্ভবের পথে বিস্তার করে ধরতে লাগল—উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ একটি যুবক, ললাটে গরিমা, অধরে করুণা। সুমনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সে অনুনয় করছে তাকে ভালবাসবার জন্য, বিবাহ করবার জন্য। মুখের কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সুমনা—"জানি সুমনা, তোমার দুঃখ। বিজয়কে আমি চিনি। তার মত লঘুচিত্ত, স্বার্থসর্ব্বস্ব লোক তোমার একনিষ্ঠ প্রেমের উপযুক্ত নয়। ভালই হয়েছে। তোমার জীবন থেকে সে সরে

গেছে। একবার কাঁদ সুমনা; সারা জীবন অযোগ্যকে ভাল-বাসার ব্যথা থেকে তো মুক্তি পেলে।

আমার দিকে তাকাও, সুমনা। চেয়ে দেখ তো আমিই তোমার মনে ছিলাম। তুমি ভুল করেছিলে। বিজয়কে তুমি ভালবাসনি, তার মধ্যে দিয়ে তোমার কুমারী-জীবনের স্বপ্নকে পেতে চেয়েছিলে। সে স্বপ্ন বিজয় নয়, তাই সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। আমাকে দেখনি বলে চেননি। আজ চেয়ে দেখ, সুমনা।”

সহসা নিবিড় পুলকে সুমনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আছে, আছে। জগতে ভালবাসবার লোক আছে। বিজয় বিশ্বের একমাত্র পুরুষ নয়। কিন্তু, এই কি হবে? এই কি পাওয়া যাবে? এরই জন্য ট্রেণের কামরায় উঠবার পর তার মন অজানা আশায় আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। অথবা সে রেল ভ্রমণের সহজাত অনুভূতি? কোথায় দেখা পাবে সে এমন লোকের? আজ দুই দিন কেটে গেছে। আগামী কল্যের পরের দিনই কলিকাতার সেই যন্ত্রণা-বেদনাময় পিঞ্জরে ফিরে যেতে হ'বে। বিজয়! দীর্ঘ তিন বৎসরের প্রতীক্ষা-ব্যাকুল প্রেম শেষ হয়েছে। কিছুই নেই আর। মিথ্যা আশার প্রলোভনে ধরা দিয়ে লাভ নেই কিছু। যা সম্ভব নয় তার স্বপ্ন নিয়ে বৃথা এ কালক্ষেপণ। বিজয়ের স্বপ্ন যেমন ভেঙ্গে গেছে তেমনি এ অলীক মোহস্বপ্ন ভেঙ্গে যাক! স্ত্রৈণ দাদার আশ্রয়ে ন্যাকা বউদির মনোরঞ্জন করতে করতে বিষাদময় একঘেয়ে জীবন

কেটে যাবে, কিছুই পাওয়া যাবেনা। কি করে পাওয়া যেতে পারে সে ধারণা নেই তার।

কিন্তু, পেতেই কি চাই? বিজয়ের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে চাওয়া তার মনের দিক থেকে অসম্ভব বলেই দুইদিন পূর্ব্বেও সুমনা জেনেছিল।

বাড়ীর মধ্যে দিদির গলার স্বর শোনা গেল,—"কই সুমনা, কোথায় গেলি? তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে বেরোতে হ'বে মনে নেই?"

তাড়াতাড়ি সুমনা তোয়ালেটা হাতে করে অন্দরের দরজায় পা দিল। পেঁপেগাছের পাশে, ইঁদারার ধারে এই দিবাস্বপ্নটি তার স্মরণে অক্ষয় হয়ে থাক। কানের পাশে অশ্রুত সেই কথাগুলো যেন বাজছে। কিন্তু নূতন প্রেমের আগমনী স্বপ্নে সে তন্ময় হ'তে পারল কেমন করে? এত তাড়াতাড়ি! আশ্চর্য্য তার দ্বিচারী মন! সুমনা বিস্মিত হ'ল।

(তৃতীয় দিন)

কলিকাতায় ফিরে যাচ্ছে সুমনা দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে—তিনদিন পরে। আবার ট্রেনের কক্ষে জানালার ধারে সে বসে আছে। এবারে তার মনের কথা সে-ই বলুক :—

কিছু পেলাম কি? কোন আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ তো এলনা আমাকে দুঃখ ভুলিয়ে দিতে! কোন নূতন স্বপ্ন তো গড়ে

উঠল না ভগ্ন স্বপ্নের জীর্ণ ভিত্তিতে! "Dupe of to-morrow even from a child." বিদেশী কবি কথাটা আমাকে না চিনেও আমারি সম্বন্ধে বলে গেছেন সন্দেহ নেই। স্বপ্ন দেখেই আমার জীবনটা কেটে যাবে—সে স্বপ্নের সাফল্য দেখা হ'বে না।

কেটে গেল তিন দিন। কিছু হ'ল না। বিবাহিত এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে তিনটি দিন কাটালাম আমি। এ সাহচর্য্যে কোন তরুণ যুবকের দেখা পাইনি। দিদি ভাল-বেসেছেন, জামাইবাবু আদর করেছেন। কলিকাতার গতানুগতিক জীবনের ক্রূর বন্ধন তিনদিন আমাকে স্পর্শ করল না। জলের সাবলীলতায় কেটে গেল দিন তিনটি। এইমাত্র।

ফিরে চলেছি আবার বধ্যভূমিতে। আইফিজেনিয়ার মত আমাকে হত্যা করা হয়েছে; কোন প্রেমিক-দেবতা আমাকে রক্ষা করল না পুরাণবর্ণিত আইফিজেনিয়ার মত। কলিকাতা ফিরছি আর মনের কোণে বেদনার টান লাগছে। আবার ব্যথা পেতে যাচ্ছি।

তবে কি সুখ পেয়েছিলাম এখানে? আসবার সময়ে বেদনার শৃঙ্খলে মন বাঁধা ছিল ব্যথারি স্থানে। ছেড়ে যেতেও পারছিলাম না। নূতন কিছু চাইবার শক্তিও ছিল না। পরাজিত বন্দীর গ্লানি পরাজয়ের সঙ্গে নাগপাশে জড়িয়ে রেখেছিল। মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি চাইবার মনোভাব ছিল না আমার।

মুক্তি পেয়েছি কি? চোখের সম্মুখে স্বর্ণবর্ণে-উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে দিন তিনটি—তৃতীয় দিনে বিজয়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, আনন্দে হাসছিলাম! মনে হচ্ছিল, বিজয় কতদূরে পড়ে আছে, আমার এ জীবনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই—কিন্তু, আবার তো ফিরে যেতে হচ্ছে। শান্তি ব্যাহত হচ্ছে আসন্ন দুঃখকল্পনায়। সুতরাং কি পেলাম আমি?

—মুক্তি চাইবার অধিকার আমি পেয়েছি। এই তিনটি দিন আমাকে শিক্ষা দিল বিজয়কে দূরে রেখে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন আমার সাধ্যাতীত নয় এবং বিজয় বিশ্বের একমাত্র পুরুষ নয়।

পেঁপে-গাছের পাশের দিবাস্বপ্নটি! সে স্বপ্ন দেখবার আশা, সে স্বপ্ন দেখবার সাহস আমারি মনের একপাশে সঞ্চিত হয়ে আছে!—থাক্ সে স্মৃতি এই তিনদিনের স্মৃতিতে জড়িত অবস্থায় অক্ষয় হয়ে। আবার পুরাতন আবেষ্টনীতে যখন মন ব্যথিত-ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন এসব স্মরণ করব।—"They flash upon that inward eye, Which is the bliss of solitudes.—" হে মৃত, সুপ্রাচীন কবি, কি সত্য কথাই তুমি বলে গেছ?

ভয় কি? জানি, ব্যথার স্থানে ফিরে যাচ্ছি! কিন্তু সুখ পাবার উপাদান আমার জীবনে শেষ হয়ে যায়নি। আমি

ভুলে যেতে পেরেছিলাম, প্রয়োজন হলে আবার পারব। এই জ্ঞানই হ'ল আমার পরম প্রাপ্তি।

ভয় কি? গাড়ীর চক্রঝঙ্কারে আমারি মনের কথা বেজে উঠছে—ব্যথা থাক ক্ষতি নেই, ব্যথার পশ্চাতে সাহস আছে। আর সাহসের সম্মুখে রয়েছে আশা।

শূন্যের অঙ্ক

এক

পৃথিবীতে এতও শ্যামল শস্য আছে? প্রত্যহ দুইবেলা ভোজনের আসরে তাদের নিমন্ত্রণ হয়। থোড় কাটতে হবে লাট্টুর মত প্যাঁচ কষে। মোচার রসে নখ যাবে কালো হয়ে। লাউ আবার কাটতে হচ্ছে যেন তুলি দিয়ে বৃষ্টিধারা আঁকবার দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালনে। আলুর খোসা ছাড়ানো এক দুরূহ ব্যাপার। হারকিউলিসের দশম কঠোর কর্ম্মের অন্যতম বল্লেও চলে।

সোডার বোতলের মত বোতলবাহিত হয়ে দুগ্ধ এল—কো-অপারেটিভ মিল্কসাপ্লাই। শুভ্র চক্রাকারে লাগানো পিস্‌বোর্ডের শীলমোহর দেখে নিতে হ'বে। সলিল-আধিক্যে হিন্দুস্থানী গোয়ালার জবাব হয়ে গেছে।

এদিকে মশলা ইত্যাদির স্থালী নিয়ে পাচক অসহিষ্ণু প্রতীক্ষারত। তার উনুন জ্বলে উঠেছে অগ্নিকুণ্ডের মত। একটা কিছু চাপা দিয়ে উত্থানশীল অগ্নিকে উনুনের মধ্যে চেপে রাখতে হ'বে।

প্রসাধনের প্রশস্ত অবকাশ নেই আজ। তবু এরি মধ্যে একটা কিছু ভাল বস্ত্র পরিধান করে মুখে চূর্ণপ্রলেপ দেওয়াটা সমীচীন। অনিন্দিতা একা আর কতদিক রাখে?

প্রত্যহ এক চিন্তা আজ কি রান্না হ'বে? দু'বেলা, তিনবেলা একই আহার্য্য প্রস্তুতের উদ্যম। প্রেম অপেক্ষাও প্রবল শক্তি নাকি ক্ষুধার! তাইতো দেখা যাচ্ছে। কুমারী জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত আশার সমাধি হয়ে গেছে সাদা গুঁড়োলিপ্ত ময়দার টিনে আর সূক্ষ্মগ্রীব চিনির কাঁচপাত্রে। জলের টিনগুলো আজ সেতার, এস্রাজ অপেক্ষা বেশী পরিচিত। এর মধ্যে আবার হিসাব মেলানো আছে।

আজ চায়ের সঙ্গে কি খাবার করা যায়? অর্থনীতির জটীল তথ্যও এর কাছে সহজ। পর পর সাতদিন লুচি আর আলুরদম খাবার অবসানে স্বামী আপত্তি তুলেছেন।

বড় ননদের মেয়ের অসুখ। আজ একবার সন্ধ্যার দিকেও অন্ততঃ যেয়ে দেখতে হ'বে তাকে। নইলে সুদৃশ্য দেখায় না। দিদিশ্বাশুড়ির চিঠির উত্তরটা না দিলে রাগী মানুষ চটে উঠবেন। কালকে আবার স্বামীর সহকর্ম্মী অন্য একটি অধ্যাপকের বাড়ী নৈশভোজনের আমন্ত্রণ। সেই চাকর-ঠাকুর-তত্ত্ব, প্রাত্যহিক বাজারদর আলোচিত হ'বে। থোড়, বড়ি, খাড়া। উল্টে বলা যাক, খাড়া, বড়ি, থোড়।

দুই

সারাদিনটা যে কি করে কাটে! বাংলা উপন্যাস হাতে

নেই। ইংরাজি উপন্যাসগুলো পড়ে শান্তি পাওয়া দায়। নিজেদের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই। বাংলা উপন্যাস পাঠে তবুও যেন নায়িকার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রান্নাঘরের হলুদছাপা বস্ত্রাবৃতা যে সব কন্যাদের জীবনে নানাবিধ ছুঃসাহসিক রোমাঞ্চ ঘটে যায়, তাদের তুলনায় বি-এ পাশ সম্পন্ন গৃহের ছুহিতা কিছু নিকৃষ্ট নয়। তবে কেন তার জীবনে সে সব দেখা দিচ্ছেনা? কমলালেবু রংএর সেগুনকাঠের পর্য্যঙ্কে অনিন্দিতা পাশ ফিরল।

অপরাহ্ন আসছে। এখনি উঠতে হ'বে সযত্ন কেশপ্রসাধনের নিমিত্ত। গৌর গাত্রবর্ণ থাকবার জন্য, পছন্দ করা না সত্ত্বেও, পরতে হ'বে মাতার নির্দ্দেশমত প্রখরবর্ণের বস্ত্র। বিন্দুমাত্র দেরী হ'লে চলবেনা। তারপরে কতকগুলো পানসাজার পর্ব্ব আছে। কেয়াখয়ের সহযোগে সেগুলোর ধ্বংস সাধিত হ'বে মায়ের বান্ধবী-বৃন্দের মুখের অভ্যন্তরে। বাবা কর্ম্মস্থল থেকে ফেরা মাত্র তাঁর ঘোলের সরবৎ করতে হবে। কণ্ঠসঙ্গীতে দক্ষতা নেই সে জন্য সেতার, এস্রাজ নিয়ে কিছুক্ষণ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যার পর ছোট বোনের স্কুলের পড়া একটু দেখানোর ভার তার উপরে। তারপর আহারাদির অন্তে রাত্রে পনের মিনিটকাল মুখে কোল্ডক্রীম্ মর্দ্দন ও দৃঢ়ভাবে কেশ বন্ধন। কি হবে তার চেহারার উৎকর্ষ সাধনে? দেখার লোক তো কেউ নেই।

বি-এ পাশ বেকার জীবন। বিবাহের কথাবার্ত্তা চলছে বলে বাবা আর পড়তে দেননি। মনে হয়, গতানুগতিকের আবর্ত্ত থেকে সে চলে যায় বহুদূরে যেখানে আকাশ সবুজ, গাছের পাতা নীল! কিন্তু—

"Ah my birthright long is sold,
Custom chains me link by link—"

তিন

মিসদত্ত ছুটী নেওয়াতে অনর্থক কতকগুলো ক্লাশ তার স্কন্ধে আশ্রয় নিয়েছে। খাতা দেখতে দেখতে চোখের দৃষ্টি আসছে স্তিমিত হয়ে। ছুটীর দিনেও শান্তি নেই।

অসহিষ্ণু লাল পেন্সিলে তিনটে ব্যাকরণ ভুল কাটল অনিন্দিতা। কার এমন খাতা? প্রথম প্যারাতেই তিনটে ভুল অনুবাদে! মলাট উল্টে নামটা দেখা হ'ল। মালবিকার আজ কয়েকদিন থেকে যা সাজসজ্জার চটক দেখা যাচ্ছে, এ ভুল তার আশ্চর্য্য নয়। এইবার মেয়েটির পতন হবে পড়াশোনায়। এ রকম কত দেখা আছে! কাল মালবিকাকে কঠিন হয়ে তিরস্কার করতে হবে।

বেলা আর নেই। জামাটা সেলাই করা হ'ল না, দর্জ্জির বিল্ আর বাড়ানো চলে না। একদিনে কত কাজ করা চলে? মুখহাত ধুতে ওঠা যাক। চায়ের ঘণ্টা এখনি বাজবে। তার

পূর্ব্বে বিশৃঙ্খল বসন পরিবর্ত্তন করতে হবে। ঝি-এরা রোজ টোষ্ট পুড়িয়ে ফেলছে। সে কথা বলবার উপায় নেই, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিরক্ত হন। ওই ত একঘেয়ে রুটী-চা প্রত্যহ। তাও দগ্ধশোল মাছের মত খেতে হচ্ছে। শনির দশা কি না কে জানে। অবশেষে আবার দগ্ধশোল আখ্যানের শেষটুকু মিলে না যায়!

চা-পানের পর বিভাদি'র ঘরে তাঁকে গল্পে হাসিতে তোয়াজ করে আস্‌তে হবে। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্‌ হেডমিষ্ট্রেস্‌, সুনজরে থাকলে লাভ আছে। অবশ্য গেলেই তাঁর মাসতুতো ভগিনীর সিভিলিয়ানের সঙ্গে প্রেমমূলক বিবাহের এবং তৎপরে কাশ্মীর ভ্রমণের ইতিবৃত্ত শোনা চাই। কী উৎসাহে বর্ণনার ঘটা! কি বিপদ, অন্যের রোমান্সে তোমার কি?

অপরাহ্ন শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর বুক কেঁপে উঠছে অনিন্দিতার। নিদ্রা-শিথিল নয়নে খাতা দেখা শেষ করতে হ'বে। আর আগামী কালের পঠনের বিষয়টি পড়ে রাখতে হবে। তারপর সকালে উঠেই ছুটোছুটি—প্রাত্যহিক চীৎকার বদ্ধঘরে।

বসন্ত বাতাস গৃহে প্রবেশ করল কুমারী অনিন্দিতা মৈত্রের কেশস্তবকে দোলা দিয়ে। দিন কাটেনা আর। দলিত পুষ্পের ব্যর্থতায় জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খাতাদেখা থেকে মুখ তুলে অনিন্দিতা দক্ষিনের জানালার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল।

* * * *

উপরে বর্ণিত তিনখানি চিত্রই অনিন্দিতার। মধ্যের চিত্র অনিন্দিতা যা ছিল, শেষের চিত্রখানি অনিন্দিতা যা হ'তে পারে বলে ভয় পাচ্ছিল। প্রথম চিত্রটি, ভয় পেয়ে অনিন্দিতা বর্ত্তমানে যা হয়েছে।

অনিন্দিতা একটা ভুল করেছিল। কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে তার বৃদ্ধি হ্রাস হয় না। জীবনের ক্ষেত্রেও তাই বলা চলে।

আবিষ্কার

সে নিঃশব্দে শুয়ে আছে। তার নাম সুমিত্রা। তার বয়স সাতাশ। সে একটি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির ওপর দিকের অফিসর। তার বিবাহ হয় নি। সে সুন্দরী।

গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ সন্ধ্যার ছায়ায় এতক্ষণে কালো হয়েছে। সেই কালো আকাশ আলো করে গাছে ফুটে ওঠার মত সারি সারি তারা ফুটেছে। বাতাসে এখনও উত্তাপ। ক্লান্ত শরীরে তবু আরাম আসে।

সুমিত্রার বাড়ী তিনখানি ঘরের সমষ্টি মাত্র। পাচক, দাস-দাসী নিয়ে সুমিত্রা থাকে। এই আরাম ও বিলাসের নিবিড়তা সুমিত্রার নিজের গড়া। প্রসাধন-টেবিলের ওপর রজনীগন্ধার ঝাড়, উপহার নয়, নিজের অর্থে ক্রীত। খাটের নীচে ফার-বসান চটিজুতো; প্রসাধন টেবিলের টুলে একপ্রস্ত প্রবাল বর্ণের পা-জামা; তেপায়ার উপর এক বাক্স চকোলেট ও একগুচ্ছ সচিত্র ইংরেজী মাসিক; কোণে রেডিও ধীরে বেজে যাচ্ছে; ছোট সেক্রেটারিয়েটের ওপরে কলম পেন্সিল সাজান, পাইলটের প্রেসেন্টেসন সেট্; মনোগ্রাম-করা কাগজ, রূপোর কাগজ-চাপা। এর একটিও সুন্দরীর পদপল্লবে উপহার আসে নি।

সুন্দরীকেই নিজের কষ্টার্জ্জিত উপার্জ্জন থেকে কিনে নিতে হয়েছে। সেইখানেই গৌরব সুমিত্রার।

খাটের নীল আচ্ছাদনীর ওপর এলায়িত চুল সরিয়ে হাত-ঘড়ি দেখল সুমিত্রা—সাতটা কুড়ি। অফিসের পোষাক ছাড়বার পূর্ব্বেই ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চেয়েছিল।

পাশের ঘরে পোষাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে সুমিত্রা রেফ্রিজেরেটর থেকে কমলার ঠাণ্ডা রস কাঁচের টাম্বলারে চুমুক দিতে দিতে ফিরে এল। দাসী মেমসাহেবের খাদ্যাদি ঠিকমত রেখে গেছে। তিনকুলে এক পল্লীগ্রামবাসী কাকা ভিন্ন কেউ নেই সুমিত্রার। ক্ষতি নেই, টাকা থাকলে যত্ন-আদরও কেনা যায়।

এখন কি করা যেতে পারে, সুমিত্রা ভেবে দেখল। কাল শনিবার, তা ছাড়া অফিসে কাজের কোন চাপ নেই আজ। কপি-রাইটিং যা জমেছিল, সুমিত্রা বহুদিন বাড়ীতে পর্য্যন্ত কাজ করে শেষ করে ফেলেছে। মেনন অ্যাণ্ড কম্পানীর বিজ্ঞাপনের ছবি কি ভাবে আঁকতে হবে তা-ও আর্টিষ্টকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিকালবেলা ম্যানেজিংডিরেক্টর পার্টি দেবেন, কিন্তু সে ভার তাঁর সেক্রেটারী মিস্ ব্ল্যাগ্‌ডেনের ওপরে। শুধু চমৎকার সাজ করে চা খেয়ে সুমিত্রা রয় নিষ্কৃতি পাবে। ভাবতে বেশ লাগে। প্রকাণ্ড অফিসে প্রকাণ্ড টেবিল, রূপোর সার্ভিস্-সেট, চমৎকার চায়না, অটুট-ইস্ত্রি পোষাক, কেতাদুরস্ত আচরণ। পাশে যিনি বসবেন তাঁর নাম সংবাদ-

পত্র প্রায়ই অলঙ্কৃত করে। মিস্‌রয়কে এটা-ওটা এগিয়ে দিতে ব্যস্ত হবেন যিনি, তাঁর মাসিক আয়ের অঙ্ক শুনলে কাকা বিহ্বল হয়ে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে বার বার ভাইঝির দিকে তাকাবেন। কিন্তু এই সব পার্টির পিছনে কি আছে? হতাশা, হতাশা। সারাদিনের কাজের ক্লান্তি, ওপরওলার মন যোগাবার গ্লানি, ভবিষ্যতের বিফলতা। পাশের লোক চল্লিশের উর্দ্ধে, বিবাহিত, পরিবার-পরিবৃত। ব্যস্ত ভদ্রতায় যিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবেন, সুমিত্রার মত মেয়ে প্রত্যহ বহু সংখ্যায় দেখা তাঁর অভ্যাস আছে। ম্যানেজিংডিরেক্টরের বুলডগ-মন মিস্‌ ব্ল্যাগডেনের মোহিনীমায়ার শিকলে বাঁধা। অন্য চারিটি পুরুষ অফিসরের মধ্যে দুই জনের সঙ্গে সুমিত্রার প্রচণ্ড ঝগড়া। কারণ, মেয়ে হয়েও সুমিত্রার কর্ম্মনৈপুণ্য তাদের অপেক্ষা বেশী, পূর্ব্বেই প্রমোশন পেয়েছে সে। তাই আধবয়সী, সংসারচাপক্লিষ্ট অফিসর দুইটির বিদ্বেষের অন্ত নেই। আর একজন অ-বাঙালী, অত্যন্ত গম্ভীর। কারুর সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলেন না। চতুর্থ ব্যক্তি সহাস্য সুপুরুষ, অবিবাহিত তরুণ। কিন্তু সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্ত তাঁর মন সম্পূর্ণ হরণ করেছে। শীঘ্রই নাকি বিবাহও হ'বে।

সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্ত এই টেবিলে নিমন্ত্রণ পায় নি, সুমিত্রা পেয়েছে। কিন্তু সুমিত্রার সযত্নে সাহেবী ভঙ্গিতে বিন্যস্ত অলকাবলী, দীর্ঘ নখর, ক্ষীণ-শুভ্র দেহবল্লরী, রঞ্জনীরক্ত ওষ্ঠাধর,

আপাদমস্তক সূক্ষ্ম পালিশ কিছুই প্রদ্যোত বসুর চোখে পড়বে না, জানে সুমিত্রা। তাঁর মনে জেগে থাকবে অনুপস্থিতা মীনা দত্তের গোল মুখ, এলোমেলো চুল, ন্যাকা ন্যাকা কথা, আর কথায় কথায় হাসাকাঁদা। অদ্ভুত!

এখন কি করা যায়? কাছেই 'কিস্‌মেট' হচ্ছে। দেখা যেতে পারে। কিন্তু একা সিনেমা ভাল লাগে না। মঞ্জুকে সঙ্গে ডাকা যেতে পারে। কাকীমার ভাইঝি মঞ্জু হষ্টেলে থাকে, অনুমতি চাই তার পক্ষে। থাকগে, গিয়েই কাজ নেই ছবিতে।

বরঞ্চ কিছু পড়া যাক। বহুদিন ও বালাই নেই। কপি লিখে আর বিজ্ঞাপনের মালমশলা নেড়ে নেড়ে জ্ঞানের পথ বন্ধ করেছে সুমিত্রা। জওহরলালের 'The Discovery of India' ('দি ডিস্‌কভারি অব্ ইণ্ডিয়া') সামান্য একটু পড়া হয়েছে মাত্র। সেক্‌শনাল বুককেস্ থেকে বইটি নিয়ে খাটের পাশে আরাম-চেয়ারে বসল সুমিত্রা টেবল্‌ল্যাম্প জ্বালিয়ে।

বইখানা জন্মদিনে এক বন্ধুর উপহার। সেই বন্ধুই মীনা দত্তের জন্মদিনে উপহার দিয়েছে নীল ফুলতোলা ক্রেপ্ ডি-শিনের ব্লাউস্‌পিস্। এত পার্থক্য কেন? সত্যই কি সুমিত্রার জীবনের প্রতীক গুরুগম্ভীর 'দি ডিসকভারি অব্ ইণ্ডিয়া'; আর মীনা দত্তের প্রতীক ফুলতোলা জামা?

মীনার কথা ভেবে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। মীনা অতি সাধারণ, একশো ষাট টাকা মাত্র পায়। সুমিত্রার আদেশে মীনার জীবন-

মরণ হয় কর্ম্মক্ষেত্রে। এক ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে দরিদ্র পরিবারে নগণ্য জীবনযাত্রা মীনার। অতি ন্যাকা, সুলভ ধরণের মেয়ে। কি করে প্রদ্যোত বসুর মত ধীমান্ তাকে পছন্দ করে ফেললেন, বিশেষতঃ যখন সেখানে অফিসর সুমিত্রা রয় উপস্থিত ছিল?

তাতে ক্ষোভ নেই সুমিত্রার। নিজের উপযুক্ত পুরুষ সে পায় নি খুঁজে। নিঃসঙ্গ জীবনের গাম্ভীর্য্য নিয়ে সে গৌরবে সমাসীন। প্রদ্যোত বসু প্রত্যেকটি মতামতে তার শ্রদ্ধা দেখান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর পর্য্যন্ত স্বীকার করেন—"Miss Roy at times surpasses even herself". সে যা চেয়েছিল—প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, সম্মান, সবই পেয়েছে। অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করে সুমিত্রা নিজেকে আর হীন করবে না।

মনোযোগ সহকারে সুমিত্রা পড়ে যেতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই তন্ময়তা এসে গেল। একটি বিরাট মানবের বিরাট হৃদয়ের অন্বেষণ সুমিত্রার দিনযাত্রার ক্ষুদ্রতাকে কিছুক্ষণের জন্যও ভুলিয়ে দিল। ভারতবর্ষের প্রতিটি গিরিগুহায়, প্রতিটি পত্রপল্লবে যে অমর জীবনস্রোত শতাব্দীর আঘাত প্রতিহত করে আজও অফুরন্ত উৎসাহে প্রবহমান, তারই আনন্দ নেহেরুর চক্ষে ভারতের অন্তর্নিহিত সত্তাকে প্রতীয়মান করেছে। সুমিত্রা কি এই ভারতবর্ষ চেনে না? এই ভারতের অধিকার তার জন্মগত। বেদান্ত ও উপনিষদের দেশে আজ সুমিত্রার মত মেয়ের স্থান কোথায় সে কথা 'দি ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া'র কোথায় লেখা

আছে কিনা সুমিত্রা খুঁজতে লাগল। খোঁজাই বোধহয় ভারতীয় মনের বিশেষত্ব।

"The Upanishads are instinct with a spirit of enquiry, of mental adventure, of a passion for finding out truth about things. The emphasis is essentially on self-realization, on knowledge of the individual self".

সুতরাং মনের মধ্যে এই অন্বেষণের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে। সহসা প্রদীপের কথা মনে পড়ে গেল। সহপাঠিনী নিবেদিতার বড়ভাই সে। বহুদিনের আলাপ আজও জমে ওঠেনি। কারণ প্রদীপ কিঞ্চিৎ লজ্জাশীল; পিতার অফিসে নির্ব্বিবাদে কাজ করে বাকী সময় ক্যামেরা নিয়ে কাটায়। সেই স্বল্প পরিচয়কে গভীরতা দিতে হ'লে উদ্যোগী হতে হ'বে সুমিত্রার নিজেকে। হাত নিস্‌পিস্‌ করে উঠল সুমিত্রার। লবিতে টেলিফোন। এখন প্রদীপ বাড়িতেই আছে। টেলিফোনে এই নির্জ্জন সন্ধ্যার আলাপে নিশ্চয় অন্তরঙ্গতার সুর লাগবে। তারপর সুমিত্রা তাকে ডাকবে—'আসুন না, এখনও তো রাত হয় নি। কাছাকাছেই তো বাড়ী। আসুন না—'

তবে, নিস্পৃহ পুরুষকে যার ইচ্ছা সাধুক, সুমিত্রা সাধবে না।

সাধারণ প্রদীপ। প্রদীপের চেয়ে 'ডিস্কভারি অব্ ইণ্ডিয়া'র আকর্ষণ বেশী।

"But that very individualism led them to attach little importance to the social aspect of man, of man's duty to society. For each person life was divided and fixed up, a bundle of duties and responsibilities within his narrow sphere. The idea is perhaps a modern development."

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। সহসা শোবার ঘরের পরদা ঠেলে কতকগুলো প্যাকেট হাতে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল সুমিত্রার বান্ধবী সুধীরা।—"উঃ, আজ সারাদিন ঘুরছি ভাই। গাড়ীটা পেয়েছি কিনা। মনে হ'ল পথে তোর সঙ্গে দেখাটাও করে যাই। কি করছিস সুমি, একা বসে বসে? মার্কেট থেকে এই কেক-প্যাটি কিনলাম। চা আনতে বল্, ধ্বংস করা যাক।"

বই রেখে মৃদু হাস্যে সুমিত্রা চেয়ে রইল। সুধীরা তার থেকে বছর দুয়ের ছোট। তবু লেসের বাণ্ডিল আর ব্রোকেটের ফুলশোভিত এত উজ্জ্বল্ রঙের পোষাক পরবার বয়স সুধীরারও নেই। আহ্লাদে খুকী ধরণে ঘাড় নেড়ে সুধীরা বলল—"বেশ আছিস, সুমি। অতগুলো টাকা পাচ্ছিস! স্বাধীন ভাবে রয়েছিস। নিজের কর্ত্তা নিজে।"

চায়ের কথা ভৃত্যকে বলে এসে সুমিত্রা সুধীরার পাশে

বিছানায় বসাল, হাল্কা সাটীনের ঢাকনা,—"দিন দিন সৌখিন হচ্ছিস, সুমি। হবে না কেন? তোর জগৎ তো তুই নিজে।"

চা ঢেলে কাপ এগিয়ে দিয়ে সুমিত্রা নীরবে হাসল। ঈর্ষ্যা-মিশ্রিত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুধীরা মন্তব্য পাস করল—"তোর সঙ্গে নিজেকে বদলাতে পারলে বেঁচে যেতাম, সুমি।"

এবারে সুমিত্রার নীরব হাস্যে ঈষৎ আত্মপ্রসাদ মিলল। সত্যিই বেশ আছে সে, বেশ আছে। নিজের ইচ্ছা মত নিজের আদর্শে জীবন যাপন করার ক্ষমতা সে অর্জ্জন করেছে। এই ক্ষমতা হস্তচ্যুত করবে কেন সুমিত্রা? প্রদীপের রোজগার তার চেয়ে কম। তবে ধনী যৌথ পরিবারে সাচ্ছল্যের অবকাশ হ'বে। হয় তো নিবেদিতার ঘটকালি এবং সুমিত্রার নিজের উদ্যমে লজ্জাশীল প্রদীপ লজ্জা ত্যাগ করে বিবাহ-প্রস্তাব করতে পারে। নিবেদিতা বিবাহিতা। তবু অনেক ননদ, অনেক জা নিয়ে ঘর করতে হ'বে সুমিত্রার। আঙুলের কিউটেক্স-রং পান সাজার চুন-খয়েরে ম্লান হয়ে যাবে। কেতা-করা চুল রাখা চলবে না। প্রত্যহ শাশুড়ী শিশিভরা মাথাঘষা-মশলা দেওয়া লাল গন্ধতেল এবং ফিতে কাঁটা হাতে ডাকবেন—"ও ছোটবৌমা, চুল বাঁধতে এস।" প্রাত্যহিক বরাদ্দের নাপতিনী এসে দেড় ইঞ্চি লম্বা সযত্ন বর্দ্ধিত পায়ের নখ কচকচ করে কেটে ফেলে ঘষঘষ করে টকটকে আলতা পায়ে চওড়া করে লেপে দিয়ে যাবে। ছোটবউ সে হ'বে, সুতরাং মাথা থেকে ডুরে

শাড়ীর আঁচল নামানো চলবে না। সারা দ্বিপ্রহর শীতল পাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আর নভেল পড়ে চমৎকার সাফল্যমণ্ডিত কর্ম্ম-জীবনের সমাধি হ'বে সুমিত্রার।

কিন্তু মনের মত বিবাহিত জীবন হতে পারত সুমিত্রার; প্রেমের সঙ্গে কর্ম্মজীবনকেও মেলান চলত, যদি প্রদ্যোত বসুর মত কোন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ সম্ভবপর হ'ত। যে জীবনে সে অভ্যস্ত, সেই জীবন যাপন করা যেত। সুমিত্রা ও প্রদ্যোত বসু এক পর্য্যায়ের। সুমিত্রা নিজের পর্য্যায়ে থাকতে চায়, কিন্তু ভিন্ন পর্য্যায়ের ব্যক্তিকে কেন প্রদ্যোত বসু মনোনয়ন করলেন, যখন সহধর্ম্মী সুমিত্রা সম্মুখে উপস্থিত ছিল? এই বিস্ময়কর প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পায়নি সুমিত্রা।

যাক, আমার জীবনই ভাল। ফার-বসান চটির দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা সুখের নিশ্বাস ফেলে এতক্ষণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। সুধীরা এসে তাকে রক্ষা করেছে। এখনই সে প্রদীপকে টেলি-ফোন করেছিল আর কি! হয় তো, কে জানে এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাতেই তার জীবনে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলবন্ধন পড়ে যেত। সুধীরা ঠিক সময়ে এসেছে।

আনন্দিত মনে সুমিত্রা প্রশ্ন করল—"কি সুধীরা, লাল চিঠি আসছে কবে?"

হাত মুখ ঘুরিয়ে কেকে কামড় দিয়ে সুধীরা ভরা গলায় উত্তর দিল—"আর ভাই, ভাল লাগে না। এবারে সম্বন্ধ হচ্ছে জমিদার

তনয়ের সঙ্গে। খুব বনেদী সেকেলে বাড়ী। শ্রীমানের বয়স সাতাশ। ভেবে দেখ সুমি, প্রায় তোর বয়সী। তোর বয়সী লোক আমার স্বামী হ'বে, কি ভীষণ মজার কথা!"

সুমিত্রার মনের প্রান্ত চমকে উঠে সংযত হয়ে গেল আবার। তার বয়সী ব্যক্তি তারি বান্ধবীর স্বামী হবার যোগ্যতা রাখে! তা হলে সুমিত্রার বয়স এতই বেশী হয়েছে?

কেকের গুঁড়ো কাপড় থেকে ঝাড়তে ঝাড়তে সুধীরা আধ-আধ খুকীর স্বরে বলল—"এখানে বিয়ে হলে ভাই, স্বাধীনতাটি যা সামান্যও নেই নেই করে আছে, তা-ও যাবে। অতি গোঁড়া পরিবার। ছাব্বিশ বয়েসই হোক, আর বি-এ পাশই করি চলতে হবে ছাব্বিশ বছর আগের কনে' বউয়ের চালে। বাবা ওদের এত টাকা দেখে সব ভুলে গেছেন।"

সুমিত্রা ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল—"লেখাপড়াজানা বয়স্থা মেয়ে ঘরে নিয়েও কি তাঁরা তার কাছে পর্দা আশা করবেন?"

"ওই তো মজা, সুমি। পুত্র চায় শিক্ষিতা; তাই বি-এ পাস, এম-এ পাসের খোঁজ পড়ে আজকাল। কিন্তু অন্দর তার অধিকার ছাড়তে রাজী নয়। সুতরাং আলোকপ্রাপ্তা বধূকে ঘরে এনে আবার তাকে অন্ধকারে পোরবার চেষ্টা করা হয়। এই তো মজা সুমি।"

এই ট্রাজেডিতে মজার কি উপাদান থাকতে পারে সুমিত্রা খুঁজে পেল না। তবে সুধীরার কথাটার সত্য উপলব্ধি করল সে।

প্রদীপকে বিবাহ করলে সুমিত্রার ভাগ্যেও এই হ'বে। ভালই হয়েছে, টেলিফোন করা হয়নি। সুধীরাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ভৃত্য চায়ের ট্রে অপসারিত করলে সুমিত্রা বলল—"তা হ'লে এই বিয়েতে তুমি অমত জানাও না কেন?"

হাত-ব্যাগ খুলে সিল্কের রুমালে মুখ মুছে সুধীরা উত্তর দিল, "মত অমতের কি-ই বা আছে? বিয়ে যখন করতেই হবে, এক ভাবে হলেই হ'ল। বাবা-মায়ের জন্যে সব কিছু সহ্য করতেই হবে।"

কিন্তু উপরোধে ঢেঁকি গেলবার মত মুখভাব নয় সুধীরার। কথার সুরে কিছু নির্লিপ্ত আত্মসমর্পণ বেজে উঠলেও তার বাহ্য আকৃতি অন্য কথা বলে। পুলক-প্রবাহ সুধীরার দেহের প্রতিটি রেখায়।

তবে? যদি সুধীরা যেন তেন প্রকারেণ বিবাহে সুখী হ'তে পারে, সুমিত্রাই বা পারবে না কেন? পর মুহূর্ত্তেই মনকে শাসন করল সুমিত্রা। অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করবার দীনতা আজ তার ক্রমাগত দেখা যাচ্ছে। মীনা দত্ত, সুধীরা, এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ। গড্ডালিকা-প্রবাহের অন্তর্গত এরা। সুমিত্রার স্বাতন্ত্র আছে।

মন শক্ত করে সুমিত্রা সুধীরাকে একটি নাতিদীর্ঘ উপদেশাত্মক বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত হ'ল। কথা আরম্ভ করবার পূর্ব্বেই টেলিফোন বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্ করে।

"হ্যালো!" গলার স্বর সুমিত্রার আগ্রহে ঈষৎ কম্পিত, "হ্যালো, কে?" 'Hoping against hope' বলে একটি কথা ছিল শোনা, আজ অন্তর দিয়ে তার মানে বুঝল সুমিত্রা। হয়তো লজ্জার বাঁধ ভেঙেছে। প্রদীপ কি?

পুরুষালী গম্ভীর গলার পরিবর্তে মিহি ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, "আমি মাসীমা। সুমি, ধীরা কি ওখানে আছে?"

"ডেকে দিচ্ছি,"—সুমিত্রা ঘরে এসে জানাল, "সুধীরা, তোমাকে তোমার মা খুঁজছেন।"

"কি মুস্কিল, এক মিনিট শান্তিতে থাকবার উপায় নেই"—গজগজ করতে করতে সুধীরা লবিতে বেরিয়ে গেল। একলা ঘরে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। ছি, ছি, এত অধঃপতন হয়েছে তার? প্রদীপের টেলিফোন দিয়ে তার কি প্রয়োজন? একটা মেয়ের থেকে কম আয় যার, তাকে সুমিত্রা রয় চায় না।

দরজায় ধাক্কা খেতে খেতে এলায়িত অঞ্চল সামলে সুধীরা ফিরে এল, "চললাম ভাই। বাড়ীর লোকেরা নাকি আধঘণ্টা ধরে আমাকে খোঁজবার জন্যে সমস্ত বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী টেলিফোন করছে। রাত হয়েছে কি না একটু। অমনি ওঁদের ভয় হয়েছে আমি বোধহয় পথেই নিকেশ হয়ে গেছি। আর বলিস না সুমি, তুই আমার অবস্থা বুঝবি নে। সুখের

জীবন তোর। যা খুশী তাই করতে পারিস, বাধা দেবার কেউ নেই।” জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে সুধীরা চলে গেল।

এখন সুমিত্রা একা। সম্পূর্ণ হৃদয়, বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে একা। বাধা দেবার কেউ নেই, আবার ব্যাকুল হবারও কেউ নেই। সারারাত্রি যদি বাড়ী না ফেরে সে, কোন স্নেহান্ধ হৃদয় চিন্তিত হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াবে না। দাসত্ব করছে সুধীরা, সে দাসত্ব ভালবাসার কাছে। হায়, সুধীরা তার সঙ্গে নিজেকে বদলাতে চায়!

আরাম-চেয়ারে বসে পড়ল সুমিত্রা, পায়ের কাছে খসে ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে অনাদৃত ‘ডিসকভারি অব্ ইণ্ডিয়া’, পাতা উল্টে যাচ্ছে পাখার বাতাসে—“a passion for finding out the truth, ...”, ...“a bundle of duties within his narrow sphere....”

বইয়ের দিকে মন নেই সুমিত্রার। চারিপাশে তার রচিত হয়েছে একটি নিঃসঙ্গতার দুর্গ, খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জগতের সমস্ত নিঃসঙ্গ নারীহৃদয়ের বিলাপ। সুমিত্রার উদ্‌ভ্রান্ত আহ্বান ছাদ ভেদ করে উঠছে না, ডাকতে পারছে না অন্য কোন হৃদয়কে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সুমিত্রা। ঠিক এই নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকে এড়াবার জন্য নারী স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দেয়। তার সমস্ত বন্ধুরা তাই বিবাহ করছে, তাই সুধীরা বিবাহে

উৎসুক। সুমিত্রা কেবল নিঃসঙ্গতাকে বরণ করে নিতে যাচ্ছে। সুমিত্রার এই নিঃসঙ্গতা ভীতিজনক। ঠিক! তাই তো নিঃসঙ্গ প্রদ্যোত বসু সুমিত্রার এই নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্তের কাছে আশ্রয় খুঁজেছে। মীনা দত্ত সুমিত্রার মত নিঃসঙ্গ নয়, তার গৃহ পরিজনপরিপূর্ণ, শিশু-কণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে মুখর। মীনা দত্ত গৃহ রচনা করতে জানে।

আর সুমিত্রা? কাকা-কাকীর ইচ্ছা ছিল সুমিত্রার কাছে থাকেন। তা হ'লে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম হবে, ভাইঝিরও রক্ষণাবেক্ষণ চলবে। কিন্তু সুমিত্রার বাইরের নিঃসঙ্গতা যে তার অন্তরের প্রতিফলন। সে রাজী হয় নি।

হ'লে হয়তো ভাল হ'ত। নারীর চরম একাকিত্ব পুরুষকে দূরে সরিয়ে দেয়, পুরুষ চায় নীড়। আজ সুমিত্রার জীবনের ছাঁচ পৃথক হয়ে গেছে, নীড় বাঁধবার কৌশল অফিসর সুমিত্রা রয় জানে না। তাই প্রদ্যোত বসু সুমিত্রার জন্য নয়।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করে ভাবতে লাগল সুমিত্রা। আত্ম-জিজ্ঞাসা বেদান্ত ও উপনিষদের দেশের জন্মগত অধিকার। 'আত্মানং বিদ্ধি'। সুমিত্রার মত আধুনিকারও নিজেকে জানা প্রয়োজন। সুমিত্রা, তুমি কি চাও?

চাই পরম নিঃসঙ্গতাকে এড়িয়ে যেতে। আমার গৃহ রচিত হয়েছে আমার নিজেকে কেন্দ্র করে, আমার প্রাত্যহিক সুখের উপকরণ সযত্নে আহৃত করে। অন্য কোন ব্যক্তির জন্য চিন্তা-

দুশ্চিন্তার মাধুর্য্যপূর্ণ ব্যাকুলতার স্বাদ আমার জগৎ জানে না। চাই এই আত্মঘাতী আত্মকেন্দ্রিকতাকে এড়িয়ে যেতে। নিজের তুচ্ছ কর্ম্মপদ্ধতি দিয়ে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে রাখতে চাই না।

প্রদ্যোত বসুকে আমার প্রয়োজন নেই। আমার অবচেতন মন চায় প্রদীপকে, তার সুখপূর্ণ গৃহের বেষ্টনীতে। আমি গৃহ বাঁধতে পারি নি, যে পেরেছে, তারি গৃহে আমি আশ্রয় চাই।

প্রদ্যোত বসু আমার স্বপ্ন নয়। দশটায় যে যার কর্ম্মস্থলে চলে যাব, ছয়টায় কর্ম্মক্লান্ত দেহে ফিরে এসে দেখব অপর জন অনুপস্থিত। অথবা, সাজান ফ্ল্যাটের সাহেবী আবহাওয়ায় আবার একাকিত্ব অনুভব করব বাড়ীতে বসে বসে স্বামীর বহির্গমনে। আমি চাই অসংখ্য পরিজনকে অসংখ্য স্নেহের বন্ধনে বাঁধতে; তাদের জন্য প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার ও অসুবিধা-অনটনের মধ্যে আমার অতৃপ্ত অন্তরের অপরিসীম ভালবাসার প্রবৃত্তিকে ধন্য করতে। নিজেকে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। আমার পূর্ব্বে সহস্র নারী যা করেছে, আমার পরে সহস্র নারী যা করবে, আমিও তাই করতে চাই। একটি সাধারণ ছকের অঙ্গীভূত হয়ে জীবনের জটিলতাকে অতিক্রম করতে চাই।

লবিতে চলে এল সুমিত্রা। টেলিফোনে আর সুমিত্রার কণ্ঠ কম্পিত নয়—"হ্যালো, কে?....প্রদীপ বাবু বাড়ী আছেন? ...একটু ওঁকে ডেকে দিন না....

নির্ব্বাপিত

গালার-কাজ-করা কাঠের বাক্স থেকে ক্রোচেটের সুতো আর কুরুশকাঠি বের হ'ল। ভদ্রমহিলা বললেন, "এইটা আমার দশম হবে।"

ড্রেসিং-টেবল-রানার বুনছেন তিনি সাদা সুতোর কল্কা-কাজ দিয়ে। তাঁর ঘরের এমন কোন আসবাব নেই, যাতে হাতে বোনা লেস পড়ে নি। তাঁর বাড়িতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যাঁর পরিচ্ছদের কোন অংশ লেস সুশোভিত করে নি। বর্ত্তমানে মেয়েদের লেস বোনার শখ প্রায় ব্যারামে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের ভদ্রমহিলা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় রোগী।

আমাদের উদ্দেশ জেনে তিনি একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপরে ধীরে ধীরে ব'লে বসলেন, "আমি তো কথা দিতে পারছি না।"

মনীষা অনুনয়ের স্বরে বলল, "সামান্য সময়। সবাই না গেলে চলবে কেন?

ভদ্রমহিলা সাবধানে ঘর তুলতে তুলতে উত্তর দিলেন, "শরীরটা আমার ভাল নয়। ওসব গোলমালের মধ্যে গেলেই মাথা ধরে।"

"আর মাথামুড় গুঁজে লেস বুনলে কিছুই হয় না, না?"—মনীষা আমার কানে কানে জানাল। প্রকাশ্যে ভদ্রভাবে বললে, "দেখুন, পাড়ার মেয়েদের সভা। এতবড় অত্যাচারের তো কিছু প্রতিকার চাই।"…হ্যারিসন রোডের নারীনির্যাতন আমাদের পাড়ার আকস্মিক মহিলা-সভার হেতু।

নির্লিপ্ত-উদাসীন কণ্ঠে ভদ্রমহিলা বললেন, "প্রতিকার তো আমাদের হাতে নয়।"

"তা হ'লেও তো চেষ্টা করতে হ'বে। চুপ ক'রে সহ্য করলে আরও প্রতিকারের আশা নেই।"

মনীষার গরম-গরম কথা মাঠেই মারা গেল। ভদ্রমহিলার ঘোলা চোখে, একঘেয়ে গলার স্বরে বিন্দুমাত্র জীবনীশক্তি দেখা দিল না। মাথা নীচু ক'রে একমনে তিনি লেশ বুনে চললেন। ভাবলাম, যাঁর আঙুল এত সক্রিয়, তিনি মনের দিক থেকে এত অলস কেন?

মনীষা বলল, "বলুন, তা হ'লে আমরা যাই। নারীনির্যাতন দেখেও আপনার সহানুভুতি হ'ল না, এটাই তুঃখের বিষয়।" মনীষা উঠে দাঁড়াল, আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম।

মনে হ'ল, হঠাৎ ভদ্রমহিলার চোখে যেন একটা কিছু জ্ব'লে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য যেন তিনি অন্য একটা রূপ নিতে নিতে থেমে গেলেন। আবার তিনি মাথা নামালেন, অঙ্গুলির গতি তাঁর দ্রুততর হয়ে উঠল।

বহুদিন আগের কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল। আশ্চর্য! এঁর সম্বন্ধে এতবড় ঘটনাটি আমি ভুলে গিয়েছিলাম!

* * *

স্কুলের গণ্ডি সবে পার হয়েছি। একদিন বেলা তিনটার সময় দুইজন ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়ি এসে আমার মায়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। একজন কালো ও মোটা, মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিতা। অন্যজন পাতলা ফর্সা, লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি-পরিহিতা।

আমরা বালিগঞ্জী পাড়ায় নূতন এসেছি। সুতরাং আমার মায়ের কাছে তাঁদের পরিচয় দাখিল করতে হ'ল সর্বপ্রথম।

স্থূলাঙ্গী হাতের বেঁটে ছাতা দুলিয়ে গর্বের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁর স্বামী প্রসিদ্ধ লোক, নামমাত্রেই আমরা চিনলাম।

শীর্ণাঙ্গী তাঁদের আগমনের উদ্দেশ ব্যক্ত করলেন। পাড়ায় একটি বড় গোছের পার্ক আছে, সেখানে সন্ধ্যার পরে পাড়ার মেয়েরা মুক্ত বায়ুতে বিচরণ গ্রাস আলাপ ও পরচর্চ্চা করতে যান। সেই পার্কে সম্প্রতি পাড়ার পুরুষেরা একটা পাকা ঘর তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন মধ্যখানে। উদ্দেশ—বর্ষার হাত থেকে, রৌদ্রের কবল থেকে আত্মরক্ষা! সহসা ক্ষেপে উঠেছেন মহিলারা। তাঁরা বলছেন, ওখানে ওই প্যাভিলিয়ন গড়া হ'লে ক্ষতি হ'বে। মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ওই পার্কে বেড়াতে পারবেন না

কারণ, অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবৃন্দ একটা আশ্রয়ের সুযোগ পেয়ে জঘন্য ব্যবহার দেখাতে পারে। তাই কর্পোরেশনের মেয়র থেকে আরম্ভ ক'রে কাউন্সিলর, এমন কি ছোটখাট ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত তাঁদের ধর-পাকড়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন। উপযুক্ত, অনুপযুক্ত বিচার নেই, একটু বড়-দরের লোক হ'লেই এঁরা তাঁর কাছে গিয়ে আবেদন জানাচ্ছেন ঘর তোলা বন্ধ করতে। স্থূলাঙ্গীর প্রসিদ্ধ স্বামী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কার্যকলাপে একটি প্রতিবাদও করতে পারছেন না। লাভের মধ্যে তিনি ক্লাবে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরলেই হ'বে না, জনসভা ক'রে রীতিমত প্রতিবাদ জানানোও চাই। তাই এ পাড়ার মহিলাদের ডাকা হচ্ছে সভা ক'রে সেই প্রতিবাদ জানাতে।

আমার মায়ের সঙ্গে এঁরা কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। আমি দরজার পর্দা ধ'রে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এত তোড়জোড়ের আবশ্যকতা কি? আজ কয়েকজন মহিলা সন্ধ্যার সময়ে পার্কে বেড়াতে যাচ্ছেন। কাল তাঁদের এ খেয়াল থাকবে না। বর্ষা এলেই শখ ঘুচে যাবে। অন্য দিকে মন চ'লে যেতে বাধ্য। অথচ বিশাল পার্কে একটা ছাউনি থাকলে কত লোক হঠাৎ-আসা ঝড়-ঝাপটায় আশ্রয় পেতে পারে। বাচ্চা ছেলেমেয়েও তো বেড়াতে আসে। আর একটা ন্যাড়া চালার এমন কি আকর্ষণ, যে যত অবাঞ্ছিত পুরুষ সদা-সর্বদা সমস্ত ফেলে

সেখানে জমায়েৎ হয়ে বিগতযৌবনা মহিলাদের মনোকষ্টের কারণ ঘটাবে ?

বিকাল পাঁচটায় স্থূলাঙ্গীর বাড়িতে সভায় আমি ও মা উপস্থিত হ'লাম। অনেক মেয়েই এসেছেন। ছাদে শতরঞ্চ পড়েছে, সভানেত্রীর জলচৌকি বসেছে। এক হার্মোনিয়ম সামনে নিয়ে একদল কিশোরী প্রতীক্ষা করছে সভারম্ভের। নির্দ্দেশ পাওয়ামাত্র উচ্চৈঃস্বরে গান ধরল—

"আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও,
জননী এসেছে দ্বারে —"

এ ক্ষেত্রে এই দেশাত্মপ্রেমবোধক গানের কোন সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করা গেল না।

সবথেকে সকরুণ ব্যাপার এই যে, শীর্ণাঙ্গী সর্ব দিকে তাল দিয়ে কোন মতে গোটাসভার কাজ নির্বাহ করছেন— কোরাস গান পর্যন্ত তাঁকে গাইতে হ'ল। সভায় যাঁরা উপস্থিত, তাঁরা অনেকেই জীবনে কোন সভায় পা হয়তো দেন নি। স্থূলাঙ্গী নেহাৎই পিপে, কেউ ধাক্কা দিলে তবে অতি কষ্টে গড়ান একটু। শীর্ণাঙ্গী আগাগোড়া তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সভাটি চালালেন। প্রধান বক্তাও হলেন শীর্ণাঙ্গী। অগ্নিগর্ভ ভাষায় বক্তৃতা দিলেন তিনি,—'এই প্যাভিলিয়ন যদি হয়, তা হ'লে পাড়ার মেয়েদের একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাঁরা সারাদিন ঘরে বন্দী হয়ে থেকে বিকালবেলায় একটু খোলা বাতাসে বেড়ানো থেকে বঞ্চিৎ

হবেন। ওইখানে পুরুষেরা সব সময়ে ব'সে থাকবে, গান গাইবে, সিগারেট টানবে। ভদ্রভাবে কোন মহিলা নিজের সম্মান বজায় রেখে ওই পার্কে চলাফেরা করতে পারবেন না। পার্ক আমাদেরও যতটা, পুরুষেরও ততটা। আমাদের জব্দ করবার জন্যেই এই ছাউনি তোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা, মেয়েরা, প্রতিজ্ঞা করছি, কিছুতেই আমরা প্যাভিলিয়ন তুলতে দেব না।' তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল, রক্তের উত্তাপ দূরে ব'সেও বোঝা গেল অনুভবে। মনে হ'ল, এই প্যাভিলিয়ন রচনার ওপরে তাঁর জীবন-মরণ এবং আমাদেরও জীবন-মরণ নির্ভর করছে। ছোট ঘরের সীমানা থেকে তিনি যেন বহুদূরে স'রে গেছেন। তাঁর জ্বলন্ত উৎসাহ আমাদেরও অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছে। অজ্ঞাতসারেই আমিও করতালিতে যোগ দিলাম।

* * *

আজ সে শীর্ণাঙ্গী ভদ্রমহিলার এই পরিণতি। মধ্যে দশ বছর পথেঘাটে দেখাশোনা হয়েছে। আমি কলিকাতার বাইরে গেছি, তিনি বাইরে থেকেছেন। এই দশ বছরে তিনি তিন মেয়ে ও দুই ছেলের বিয়ে দেওয়া ভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজ কিছু করেন নি। পথে নেমে মনীষা বিরক্তভাবে বলতে লাগল, "ভুল লোকের কাছে আসার এই ফল। একবার সভায় গিয়ে ব'সে কিছু চাঁদা দিয়ে একেবারে কৃতার্থ ক'রে দেবেন যেন। তাতেই আপত্তি। এবারে যার-তার কাছে যাব না।"

মনীষার কথার উত্তর দিলাম না। 'ভুল লোক' কেমন ক'রে বলি? একদিন যে বহ্নিতে ওঁকে উদ্দীপ্ত দেখেছিলাম, আজ সে বহ্নি নির্বাপিত হয়ে গেছে। কিন্তু অগ্নির মৃত্যু নেই। কোথায় সে লুকিয়ে আছে নূতন রূপে? মনে প'ড়ে গেল, ভদ্রমহিলার দ্রুত অঙ্গুলির অবিশ্রান্ত সঞ্চরণ। সারা বাড়ির লেস বুনে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের দিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত। এক মুহূর্তও তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারছেন না। যে অশান্ত জীবনীশক্তি সেদিন প্যাভিলিয়নে বাধা দেবার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, সেই শক্তি আজ ফল্গুর মত অঙ্গুলির প্রান্তে ব'য়ে যাচ্ছে, তুচ্ছ লেস-বোনার তুচ্ছতর প্রচেষ্টায়। এই দশ বছর সে শক্তি হয়তো ব্যয়িত হয়েছে পাঁচটি সন্তানের যোগ্য সাথী যুটিয়ে দেবার আয়োজনে।

অসমাপ্তভাবে ব'লে উঠলাম, "কত লেস-বোনা দেখছ না?" মনীষা আমার কথা বুঝতে পারল না, সম্ভবও নয়। সে তাচ্ছিল্যে বলল, "কি যে বাজে কাজে সময় নষ্ট! মেয়েরা এমনই ক'রেই গেল!"

বাজে কাজেই মেয়েদের সমস্ত শক্তি নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। কিন্তু তারা সেটা বোঝে না—এইখানেই গলদ। মনে মনে বললাম, মনীষা, তুমিও কি গঠনমূলক কাজ করছ? আজ হ্যারিসন রোডের ঘটনায় তুমি প্রতিবাদ-সভার উদ্যোগে আহার-নিদ্রা ভুলে গেছ। মনে করছ, এটি বোধহয় বিরাট একটি মিশন। কিন্তু মনীষা, যতদিন নারীকে পুরুষ উপভোগের সামগ্রী মনে করবে,

যতদিন নারী আত্মরক্ষাশীল না হ'বে, ততদিন বাংলা দেশের মাঠঘাট এই কাহিনী প্লাবিত ক'রে দেবে। তখন তুমি কি করবে মনীষা? সেই অসংখ্য অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ে নারীর জন্য তুমি কি করবে? তুমি তখন তোমার ভবিষ্যৎ কন্যার জন্মদিনে গহনা-নির্মাণে অথবা ভবিষ্যৎ স্বামীর ওপরওলার মনস্তুষ্টি-বিধানে পার্টি দিতে ব্যস্ত থাকবে। আজ এই দিন, এই সভা তোমার জীবনে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কোন স্থানই পাবে না।

কোন কথাই মুখে না ব'লে বাড়ি ফেরবার রাস্তা ধরলাম নিরুত্তরে। সেই স্মরণীয় পার্কের পাশ দিয়েই যাবার রাস্তা। সেদিন প্যাভিলিয়ন তৈরি হয় নি বটে, কিন্তু পরে প্যাভিলিয়ন গঠনে কোন বাধা হয় নি। বিরাট ছাউনির নীচে শিশু-বৃদ্ধ জমা হয়েছেন। যে মহিলাদের যাবার দরকার, তাঁরা পাশ দিয়েই চ'লে যাচ্ছেন। কোন ক্ষতি হচ্ছে না। শুধু মনে হ'ল এই তুচ্ছাদপি তুচ্ছ ব্যাপারে বাধা সৃষ্টির প্রয়াসেই আমাদের ভদ্রমহিলার সমস্ত শক্তি কেন অযথা নষ্ট হয়ে গেল? কেন সেই শক্তি মহত্তর উদ্যমে উজ্জীবিত হয়ে উঠল না।

মেয়েরা জীবনে একবার জ্ব'লে ওঠে, সে প্রেমে—দেশের প্রতি অথবা আদর্শের প্রতি প্রেমে। সেই আগুন তারা জ্বালিয়ে রাখতে পারে না। শত তুচ্ছ প্রচেষ্টায় সেই অনল ক্ষয় হয়ে হয়ে নির্বাপিত হয়ে যায়। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে, মনীষার দল, সমষ্টিগতভাবে তোমরা দিলে কি? পুরুষ নির্মাণ

করল স্বাধীনতার দুর্গ, তোমরা ইঁট-মাল-মসলা হাতে হাতে যুগিয়ে দিলে মাত্র। মজুরের কাজ থেকে তোমরা কেউ কেউ অবশ্যই রাজমিস্ত্রীর পদে উন্নীত হয়েছ। কিন্তু ওই শেষ। সেও পুরুষের চলা পথে, তারই নির্দেশে। স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন ভারতে তোমাদের নিজস্ব অবদান কোথায় ?

শুদ্ধি

কেন এসব করছি ?

মাটির উঠোনের একপাশ গোবর দিয়ে নিকিয়ে কয়েকখানা কুশাসন পেড়ে রাখা হয়েছে। সামনে কোশাকুশি, গঙ্গাজল, গোবর, ফুলপাতা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক। বিরক্তভাবে পুরোহিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য একখানা পুঁথি খুলে ভ্রূকুঞ্চিত নয়নে মন্ত্রতন্ত্র শানিয়ে নিচ্ছেন। বিষণ্ণ মুখে মাথায় বাঁহাত দিয়ে রমার স্বামী হৃষিকেশব ডান হাতে ধুনুচিতে তালপাখা নেড়ে বাতাস দিচ্ছে। কাছে দাঁড়িয়ে বড় ভাশুর, প্রতিবেশী নারায়ণকাকা, রমার বড় ভাই গৃহস্বামী দুলাল চক্রবর্তী।

রমার পিতৃগৃহে তার শ্বশুরবাড়ির গোটা পরিবার দাঙ্গার পরে-পরেই নিজগ্রাম থেকে রিলিফে উদ্ধার হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। দুলাল চক্রবর্তী সম্পন্ন গৃহস্থ, আদরযত্নের অভাব হয় নি, বিশেষতঃ যখন রমার বিধবা মাতা এখনও বর্তমান সংসারে এবং তাঁর হাতে টাকাও আছে কিছু।

রমাদের প্রাণ বেঁচেছে সকলের, কিন্তু সব থেকে বড় ক্ষতি হয়েছে, মান গেছে। বাড়ির মেজোবউ রূপসী রমাকেই ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল দুর্বৃত্তেরা। চারদিন পরে তাদের ঘর থেকে সে

উদ্ধার পেয়েছে। আজ এই আয়োজন তারই শুদ্ধি এবং প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন।

বড় ভাই উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা করেছেন। পুরোহিতের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না এ ব্যাপারে মন্ত্র পড়ানো। কিন্তু দুলাল চক্রবর্তীর গৃহে বারো মাসে তেরো পার্বণ, তাতে মোটা দাগে দক্ষিণা পাওয়া যায়। কাশী-ভাটপাড়ার পণ্ডিত-মণ্ডলী এক্ষেত্রে শুদ্ধির বিধানও দিয়েছেন। সম্প্রতি গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। গরম খুন তরুণের আগুন হয়ে উঠেছে। মাথাখানাও দু-ফাঁক হয়ে যেতে পারে।

নারায়ণকাকা এসেছেন উদারতা দেখিয়ে যোগ দিতে। সাময়িকপত্রে কবে নারী-জাগরণ সম্পর্কে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই স্মরণীয় ঘটনার পর থেকেই তিনি প্রগতিশীল। মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবৃত্তি করছেন, "আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধর গো।"

বড় ভাশুর হ্যাঁ-না কিছুই বলছেন না। যাঁদের দয়ায় আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁদের মেয়েকে গ্রহণ না করার কথা ওঠে না। বিশেষতঃ ব্যাপকভাবে এই নারীহরণ সংঘটিত হয়েছে। সবাই ফিরে নিচ্ছে, তিনিও নেবেন। "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"—এই পংক্তিটিতেই তাঁর মনোভাব পরিস্ফুট।

হরিকেশব এ পর্যন্ত নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখে নি।

হয়তো দেখতে ভয় পাচ্ছে। বাইরের কাজকর্মে অনর্থক ব্যস্ততা দেখিয়ে, ছোটাছুটি ক'রে সে নিজের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করছে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে। রমার রূপে তার আসক্তি আছে, রমার গুণে তার শ্রদ্ধা আছে। অমন পত্নীকে ফিরে পেয়ে সে বেঁচে গেছে। কিন্তু তবু, কি অস্বস্তি, অজানা আশঙ্কা!—থাক্, হরিকেশব তাড়াতাড়ি দূর্বাগুলো গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত হ'ল।

রমার তেরো বছর বিবাহ হয়েছে। এক কন্যা, দুই পুত্র। বারো বছরের মেয়ে মার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এ মা যেন আর মিনির মা নেই, কেমন ক'রে পর হয়ে গেছে। প্রতিবেশী বন্ধু হারাণীর মা দয়াপরবশ হয়ে বাড়ির ছোট ছেলেপিলেদের তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে রেখেছেন। চোখের ওপরে ওসব প্রাচিত্তির দেখে বাছাদের মন-টন কেমন করবে, তাই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রমার ধার্মিকা মা বাসন-কোসন রাখবার চোরা-কুঠুরির মেঝেতে একখানা কম্বল বিছিয়ে প'ড়ে আছেন। শিয়রে হরিনামের ঝোলা।

রমার বড় জা অতি যত্নে, মমতায় বিগলিত হয়ে রমার বাপের বাড়ির সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে ছোটজাকে আদর করছেন, লক্ষ্মী দিদি আমার, মন খারাপ ক'রো না। তোমার দোষ কি বল? আমরাই তো তোমাকে রক্ষে করতে পারি নি।

ছোট দেওর তরুণ, সুতরাং স্বেচ্ছাসেবকের দলে নাম লেখানো আছে। মেজো বউদির এই অঘটনে তার উৎসাহের সীমা নেই। এইবার ঘটা ক'রে বউদিকে ঘরে নিয়ে বন্ধুদের কাছে উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখানো যাবে। ভালই হয়েছে, এ একটা গৌরব যেন তার। চেনার মধ্যে একমাত্র তারই পরিবারে নারী অপহৃতা হয়েছে। তা হ'লে তো নির্যাতনের গুরুত্বে সে মহনীয়। তবে বউদির মুখ থেকে যে কিছুতেই কোন কথা বার করা যাচ্ছে না! বিশদ বর্ণনাটা শোনবার লোভ সংবরণ করা যায় না। কাগজে আজন্ম অদম্য আগ্রহে নারীহরণ পড়া দেওরের অভ্যাস! ছটফট ক'রে সে একবার বাইরে দলে, একবার ঘরে বউদির কাছে যাতায়াত করছে।

রমার ভাজদের নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই বাড়ির অভ্যাগত-বাহুল্যে। রমার কথা যখনই মনে হচ্ছে, বুক কেঁপে উঠছে তাদের। যদি ওই দশা তাদের হ'ত? ও বাবাঃ, গোবিন্দ, গোবিন্দ!

রমা! ছোট্ট নাম, ছোট্ট মানুষটি, ছোট্ট জগৎ তার নিয়ে সুখেই তো ছিল। সহসা ঐ রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ঝড়ে সে গৃহছাড়া হয়ে উড়ে পড়ল জনতার মুক্ত প্রাঙ্গণে। সকল দৃষ্টি তার দিকে। বুকভরা-মধুপেলব-কোমলা বাংলার বধূ বাঁচে কি ক'রে?

স্নান করিয়ে কোরা লালপাড় শাড়ি তাকে পরানো হ'ল।

এক দুই ক'রে মাটির উঠানে লোকজন জমা হচ্ছে। নিষেধ করা যায় না। জনমতের প্রসন্নতার ওপরেই তো রমার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে। সিঁথির সিঁদুর, হাতের লোহা, স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মা, অবিচলকুলের কন্যা—কিছুই, কিছুই আজ তাকে বাঁচাতে পারবে না। তার কল্যানময় অতীত ছাই হয়ে গেছে, তার ভবিষ্যৎ বাঁধা হ'বে ওই লৌকিক অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে রামা-শ্যামা-যদু-মধুর অনুমতিতে। সুতরাং তৃণাদপি ক্ষুদ্র হও রমা।

কেন এসব করছি? আমার কি দোষ? পাপ করি নি, প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'বে! শুদ্ধি? কার? আমার? না, আমার না, সেই নদীর পারে সহরের অসংখ্য বড়লোকদের, যাদের লোভ আর বিদ্বেষের ঝড় ব'য়ে গেল আমার ওপরে।

প্রায়শ্চিত্ত আমি করব কেন? আমার স্বামী করুক, সপ্তপদীর সুমধুর মন্ত্রের পাকে পাকে আমার রক্ষার ভার যার সর্বাঙ্গে জড়িয়েছে। চন্দন-টোপর প'রে স্ত্রীর অগ্রে পদক্ষেপ করলেই বিষ্ণু হওয়া যায় না। প্রায়শ্চিত্ত করুক সেই পুরুষ, যে নারীকে রক্ষা করতে পারে না। করুক সেই তরুণেরা, এখনও সিগারেট-অধরে যাদের পরচর্চার প্রলোভন আছে।

কুশাসনে রমাকে বসান হয়েছে। অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেল। ঘরে ঘরে মাটির হাঁড়ি অশুদ্ধ হয়েছে, ফেলে দিলে

আর চলে না। সুতরাং গোবর-গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নাও। অন্তত মোটা রান্নাটাও তো চলবে।

ছোট নামের ছোট মানুষ ছোট ঘরের কোণে বেশ ছিল। বড় মাথার বড় বুদ্ধি আজ ছোটকে খড়কুটো জ্বালিয়ে বড় আগুন প্রস্তুত করছে।

এসব কেন করছি? কি নির্বোধ রমা! যুগ যুগ ধ'রে তো তুমি এই করেছ। রামের সীতা, সীতারামের রমা রূপে তুমি তো চিরকাল এই করেছ। অক্ষম পুরুষের অক্ষমতার জের টেনেছ তুমি তোমার বিচার করেছে সেই অক্ষম পুরুষ। হাস্যকর ভাবে তোমার শুদ্ধির বিধান দিয়েছে সেই পুরুষ দয়ার্দ্র চিত্তে। তুমি আত্মহত্যা করলে তোমার যশোগান গেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তোমাকে প্রগতিশীলা দেখলে নিন্দা করেছে, বিবাহ ক'রে সমান অধিকার দিতে চায় নি। অবলা তুমি, স্বেচ্ছায় রক্ষার ভার সবলের হাতে তুলে দিয়ে পরাধীনতার আরামে নিমগ্ন ছিলে। আজ আশ্চর্য হচ্ছ কেন? তোমার ব্যথায় নেতাদের মাথা ধ'রে উঠেছে। যে যা বলে, ক'রে যাও। তোমার আগে অনেকে করেছে, তুমিও কর। কিন্তু রমা, তোমার পরে কেউ করবে কি না জানি না।

রাত্রির অন্ধকার গাছের ছায়ায় ছায়ায়। পাতায় পাতায় জোনাকি জ্বলছে। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়কির পুকুরের ধারে

গালে হাত দিয়ে রমা একা ব'সে আছে। রাত একটা হ'বে।

চারিপাশে স্বেচ্ছাসেবকেরা গ্রাম রক্ষা করছে। তাদের চলাফেরা, কোলাহল শোনা যাচ্ছে। অপহৃতা রমার দ্বিতীয়বার অপহৃত হবার ভয় নেই। তবু তো লোকে ব'লে, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়। কিন্তু রমার কোন ভয় নেই। শুদ্ধির ব্যবস্থা তো হাতেই আছে।

সত্যি, ভয় গেল কোথায়? রাত একটার সময়ে নির্জন পুকুরপাড়ে একা ব'সে থাকবার মত সাহস কোনদিনও রমার ছিল না। আজ তার ভয় নেই। যে মাধুর্য-সঙ্কোচের আবরণ রমাকে জগতের উগ্র বাস্তবতা থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিল, ঝড়ে সে আবরণ খ'সে গেছে। চরম যা হ'বার সবই রমার হয়ে গেছে, শেষ দেখে ফিরে এসেছে রমা। জগতের দীর্ঘ রাজপথের মিছিল আর রমার মধ্যে পার্থক্য নেই আর। অজানার ভয় নেই রমার।

আজকের অনুষ্ঠানের মূল্য কতটুকু রমা তার নূতন দৃষ্টিতে বুঝতে পারল। আজ সহৃদয়তার তুফানে যেসব সংকীর্ণ হৃদয়-যমুনার মরা জলে জোয়ার এসেছে, সে জোয়ার চ'লে যাবে। অপহৃতা রমার নামের সঙ্গে কলঙ্কচিহ্ন চিরদিন লেগে থাকবে। আজ বড় জা 'লক্ষ্মী' ব'লে ডেকে তাকে নামের মর্যাদা দিয়েছেন, কাল তাঁর বয়স্থা কন্যার বিবাহের সময়ে তিনি লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মী জ্ঞান ক'রে বিচলিত হ'বেন। আত্মীয়স্বজনেরা মনে মনে জানবেন,

একদিন অভাবনীয় কিছু ঘটেছিল এই অতিসাধারণ মেয়েটির জীবনে। তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে সেই জানা ফুটে উঠবে; যদি নাও ফুটে ওঠে, রমার চক্ষের বিশেষ লক্ষ্যে উঠবে। রমা কি আর তাঁদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে?

আজ প্রথম স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় রমা শয়ন করেছিল এই ব্যাপারের পরে। ছেলেমেয়েদের বাড়ির অন্যান্য মহিলারা সকলে ভাগাভাগি ক'রে কাছে রেখেছে রমার ঘরে না দিয়ে। বিছানাপত্রও একটু প্রখররূপে পরিষ্কার। তেরো বছর পরে প্রায় বাসকশয়নের অবস্থা আর কি।

বাড়ির থমথমে বিষণ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে শিথিল চরণে রমা স্বামীর ঘরে নিজের অধিকার বুঝে নিতে ঢুকল। স্বামী ঘুমন্ত। পায়ের কাছে ধীরে ধীরে মাথা নামাল রমা। শুদ্ধির পরে স্বামী ছাড়া সবাইকে প্রণাম করা হয়েছে। স্বামী তখন কি একটা কাজে বাইরে চ'লে গিয়েছিলেন।

মনে হ'ল, হরিকেশবের নিস্পন্দ শরীরে একটা স্পন্দন জেগে উঠল। বহুদিনের অভ্যাসক্রমে রমা অনুভব করল, স্বামীর শোণিতে পত্নীর স্পর্শ চিরাভ্যস্ত সাড়া তুলেছে। দীর্ঘদিনের দৈহিক বিরহের পরে প্রকৃতির নির্মম ইঙ্গিতে পুরুষের দেহে আহ্বান জাগ্রত হয়েছে নারীর সুকোমল আত্মনিবেদনে। কিন্তু মানুষের জটিল বুদ্ধিবৃত্তির কাছে প্রকৃতির সহজ আবেদন প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। হরিকেশব

নিজেকে সংযত ক'রে ঘুমের মুখোসে স্ত্রীর কাছ থেকে আত্মগোপন করাটাই আপাতত জটিলতার শ্রেয় মিমাংসা মনে করল। মনের অপরাধবোধ ও দ্বিধা দূর হচ্ছে না। কেমন যেন মনে হচ্ছে, তেরো বছরের ঘর-করা সহধর্মিণী এ রমা নয়। নিদারুণ অভিজ্ঞতার বিকৃত কবলে হরিকেশবের রমাও বোধহয় বিকৃত হয়ে গেছে।

রমা চুপ ক'রে নিজের জায়গায় শুয়ে রইল। সে বুঝেছে হরিকেশব ঘুমোয় নি। আজকের রাত্রে তার চোখে এত সহজে ঘুম আসবে না। একটা কঠিন অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাবার লোভে এই কপট নিদ্রা। জৈব প্রয়োজনে স্বাভাবিক ভাবে এক নিমেষে যে মিলন বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙ্গে সংঘটিত হ'তে পারত, মানুষের তর্কশাস্ত্র তাকে দূরে ঠেলে দিল।

কিন্তু গলদ তো সেইখানেই। আত্মীয়স্বজনের নির্লিপ্ত ঔদার্য স্বামীর পক্ষে অসম্ভব। দৈহিক আকর্ষণ বিবাহের ভিত্ত, সেই দেহ মিলনের মূলেই আঘাত লেগেছে। চারটি রজনী কেটেছে রমার—কুমারীর নিঃসঙ্গতায় নয়, বিবাহিতা রমণীর ভোগসঙ্কুলতায়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে নয়। এ কথা সবাই ভুলবে, স্বামী ভোলে কি ক'রে! দিনের পর দিন কাটবে। ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি মানুষও একদিন ঈশ্বরের করুণায় হতভাগিনীকে বক্ষে স্থান দেবে। একদিন না একদিন প্রকৃতি জয়ী হবে, মিলনে ছেদ থাকবে না। তবু সেই মিলনে কাঁটা হয়ে প্রহরা দেবে ছোট ছোট দ্বিধা, সন্দেহ, ভীতি।

রমা শুয়ে থাকতে পারল না। পুকুরঘাটে গিয়ে বসল, অত নির্জনতা নেই অন্য কোথাও। ভয় কি তার? সমস্ত জগতের বিশালতায়, জনতার পদচারণে রমা একা। তার কেউ নেই। তার দেশ নেই, দেশবাসী নেই। রমার কথা কেউ ভেবে নিদ্রা ব্যাহত করবে না। রমার গান্ধী নেই, জওহরলাল নেই। রমা বড় একা।

পুকুরে অনেক জল, সে জল শীতল, এ জানা কথা। কিন্তু নির্বোধ রমার নিস্তরঙ্গ চিত্তে অতবড় কামনা, অতবড় বেপরোয়া সাহস উদয় হ'ল না। মরা যে ইচ্ছাধীন, সে কথা রমা কোনদিন ভেবে দেখে নি। অপরাধ না করলেও অপরাধী-প্রথায় চোরের মত বিষপান ক'রে জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া একটা সর্বজনসমর্থিত প্রথা হ'তে পারে, সাদাসিদে রমা তা জানে না। পশু যেমন ক'রে আবহাওয়া বোঝে, তেমনই ক'রেই রমা শুধু বুঝেছে, এ লজ্জা রমার লজ্জা নয় এ লজ্জা বিস্তৃত-দিগন্তব্যাপী। অনেকদিন ধ'রে এ লজ্জা অনেকেরই মুছতে হ'বে অনেক কষ্ট ক'রে। সুতরাং বাংলা উপন্যাসের নায়িকার মত রমা জলে নামতে উদ্যোগী হ'ল না।

সে তো অনায়াসে মরতে পারত। ছোট জায়গা তার পূরণ হয়ে যেত। ছোট মানুষ সে বড় হয়ে গেছে আজ, এই তো সমস্যা। এ সমস্যার দিব্য সমাধান হ'ত দীঘির জলে, কোন প্রয়াস করতে হ'ত না। দড়ি-কলসী লাগত না পর্যন্ত

বাজারের যত দড়ি-কলসী নেতা ও মহাজনদের জন্য সঞ্চিত রেখে রমা মরতে পারত বিনা আড়ম্বরে।

পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ব্যাকুল স্বামী নয়, সামনের চালাঘরের দুলে-বউ এসেছে। পায়ের কাছে সিঁড়িতে বসল দুলে-বউ, দুই-একবার রমার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, "এত রাত্রিরে একা ব'সে আছেন কেন দিদিঠাকরুণ? সময় ভাল না। আমার ঘর থেকে দেখে দেখে আসলাম শেযে। ভাবলাম যদি কোন দরকার থাকে। কর্তাকে ডাক দিয়ে জাগিয়ে এসেছি। ঘরে যাবেন না?"

রমার অবশ শরীরে দক্ষিণের হাওয়া লাগল। আর তো সে একা নয়। হাত বাড়িয়ে রমা দুলে-বউয়ের হাত ধরল

জিভ কেটে হাত ছাড়িয়ে দুলে-বউ পায়ের ধুলো নিল, "ও দিদিঠাকরুণ, ছুঁলেন যে আমাকে! ছোঁয়া প'ড়ে গেল। এত রাত্তিরে আর কি করবেন? কাপড়খান ছাড়েন গা ঘরে যেয়ে।"

রমা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে সম্মান অন্তত একজনও ভোলে নি। অন্তত একজনও মনে করেছে রমা রমাই আছে। সে একজন সবল নয়, সেও রমারই মত অবলা। হাত বাড়িয়ে রমা দুলে বউয়ের হাত আবার ধরল। এমনই অনেক দুর্ব্বল হাত পরস্পরকে আশ্রয় দিলে বল আপনি আসবে। বহুদিন চ'লে

গেছে পুরুষের মুখ চেয়ে। আজ এমনই কোমল হাতের শক্তিই প্রয়োজন। রমা তো আর একা নয়।

অস্পৃশ্য ছুলে বউয়ের হাত ধ'রেই রমা উঠে দাঁড়াল, সহজ গলায় বলল, "ঘরেই যাচ্ছি। আমাকে একটু এগিয়ে দেবে চল।"

একটি মেয়ের কথা

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে।"

মৃণালিনী! মৃণালিনী! মৃণালিনী!

প্রভাতের প্রথম আলোর রেখা মৃণালিনীর মুদ্রিত চোখের পাতা স্পর্শ করল। চোখ মেলে জেগে উঠে মনে হ'ল মৃণালিনীর জানালার পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছে পাখী ডাকছে তাকেই নাম ধরে।

আকাশে বাতাসে সুখের ইঙ্গিত কেন? ফাল্গুনের ধরণী যেন দূরের স্বপ্নকে আয়ত্তের মধ্যে এনে দিতে চায়। রুটিনের চক্রান্তে মৃণালিনীর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল, কে তাকে জীবনের চরম প্রাপ্তির সন্ধান জানাল!

শয্যা ত্যাগ করে উঠল মৃণালিনী। মনে তার উদিত হ'ল—বিগত রজনীর স্বপ্ন।—অনুর্ব্বর, রুক্ষ মরুভূমি একটি, কোন গুল্মলতার চিহ্ন নেই। সহসা সেই মরুভূমির আকাশে দেখা দিল একখণ্ড মেঘ, বারিপাতে শুষ্ক বালি সিক্ত হয়ে গেল। মরুভূমির বক্ষে জেগে উঠল হরিৎ শস্য-সম্ভার।

এই শস্য-সম্ভার আজ তার জীবন, যে জীবন সামান্য

কিছুদিন পূর্ব্বে মরুভূমির রুক্ষতায় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। প্রেম, তোমার শক্তি কি এতই অসামান্য ?

শুধু প্রেম কেন ? জীবন, জীবন। যে-জীবন পদতলে দলিত হয়েও মরে না, অদম্য শক্তি যার। ধ্বংসস্তূপের নৈরাশ্য ভেদ করে যে জীবন সহস্র নূতন জীবন নিয়ে জেগে ওঠে, সেই জীবন মৃণালিনীকেও শক্তি দিয়েছে নূতন করে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার।

আজ তার একটি দুর্লভ মুহূর্ত্ত। সমস্ত জগতের বাধা, অপযশ তুচ্ছ করে আজ নিজেকে তার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পুতুল প্রতিষ্ঠা নয়, আত্মার স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা। মৃণালিনী, সে ক্ষমতা তোমার আছে কি ?

প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার এই প্রাচীন রাস্তায় এই পুরাতন বাটীতে মৃণালিনী নামে একটি মেয়ে জন্মেছিল। সংস্কৃতকাব্যবিশারদ পিতা নাম রেখেছিলেন 'মৃণালিনী'। বনেদী হিন্দুঘরের উপযোগীভাবে বাল্যবিবাহ হয় তার পালটি ঘরে। সে বিবাহ আজ অস্পষ্ট ছবি মাত্র মৃণালিনীর মনে। কেবল মনে আছে সে বিয়ে করতে চায়নি, সে তখন স্কুলে পড়ত। সে কেঁদেছিল—কিন্তু বিদ্রোহের সাহস ছিল না, বয়সও ছিল না।

স্বামীকেও মনে নেই তার। ভাল করে পরিচয় হ'বার

আগেই মৃণালিনীর সমস্ত জীবন নিষ্ফলতায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বামী মারা গেলেন। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরকুল অলক্ষণা বধূর দায়িত্ব এড়িয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। এক শীতের প্রত্যূষে মৃণালিনী পিতৃগৃহে ফিরে এল।

কী ভীষণ সে দিন! কিশোরী মৃণালিনী আশা করেছিল, পিতৃগৃহের স্নেহচ্ছায়ায় হয়তো তার জন্য সান্ত্বনা সঞ্চিত আছে। কিন্তু, তার শাদা থানপরা, নিরাভরণা বিধবার মূর্ত্তি দেখে মাতা ঘরে দুয়ার দিলেন। পিতা ঘন ঘন ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করতে লাগলেন। ভাইবোনেরা দূরে দূরে স্তব্ধ হয়ে রইল। যেন মৃণালিনী মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা, কাছে গেলেই গ্রাস করে ফেলবে।

সেইদিন থেকে মৃণালিনী নিজের মধ্যে নিজেকে আবৃত করে পিতৃগৃহের একটি সাধারণ আনুষঙ্গিক হয়ে দিন কাটাতে লাগলো। সে আর মৃণালিনী রইল না, যে-মৃণালিনী ক্লাসে প্রথম হ'ত, যার জীবনে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে হ'ল আচারপরায়ণ মাতাপিতার দুর্ভাগিনী, অলক্ষণা নামহীনা কন্যা মাত্র। বাংলার ঘরে ঘরে তার মত মেয়ে শত-শত আছে, যারা মৃণালিনী নয়, মৃণাল নয়, কিছু নয়,—বিধবা।

পাশের ঘরে পিতার খড়মের শব্দ শোনা গেল—খটাখট খটাখট। এই শব্দ চিরদিন মৃণালিনীর মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে আঘাত করে ভোরবেলার মধুর তন্দ্রা থেকে জাগরিত করে

তোলে। আজ তার মনে হ'ল, এই ধ্বনি তার বন্দী জীবনের লোহার শিকলের প্রতিটি পরত কেটে ফেলে দিচ্ছে। আবার সে মানুষের মত করে বাঁচবে।

পূজোর ঘরে সাজ-নৈবেদ্য করতে ঢুকল মৃণালিনী হাত মুখ ধুয়ে। তার মাতা ধর্ম্মকর্ম্ম করতে ভালবাসেন, কিন্তু সেজন্য সামান্য পরিশ্রমটুকুও তিনি স্বীকার করতে চান না। ফুল তোলে মালী, যোগাড় দেয় মেয়ে। আসনখানি পেতে ধূপকাঠি পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখে দেয় মৃণালিনী। স্থূলদেহ কষ্টে টেনে নিয়ে মাতা আসনে বসে কোনমতে পরকালের ধর্ম্মের খাতায় হাজিরা সই করেন! সংসারের অন্য দশটা কাজের চাপের মধ্যেও মায়ের ধর্ম্মরক্ষার প্রতি চোখ রাখতে হয় মৃণালিনীর।

কি অমানুষিক চেষ্টায় এই আবহাওয়া থেকে প্রবেশিকা পাশ করে স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে মৃণালিনী শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে নিয়েছে সে কথা ভাবতে এখনও হৃৎকম্প হয়। বাড়ীতে একটু একটু করে নিজে পড়াশোনা করে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল সে। পরীক্ষা দেওয়াতে বাবা আপত্তি জানালেন,—"কি হবে বিধবা মানুষের পরীক্ষা দিয়ে? কোন কাজে লাগবে ওর শুনি? এর চেয়ে যদি চায় কাশী যেয়ে থাক—"

সেদিন বড় ভাই মৃণালিনীর পক্ষ নিয়েছিল, "লেখাপড়া মানুষের সব সময়েই কাজে লাগে, বাবা। একুশ বছর বয়সেই

কাশী যাবে কেন?" তুমুল বিতণ্ডার পরে বাবা বিরক্ত হয়ে চুপ করলেন।

পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল সে। কিন্তু সহস্র মেয়ের মধ্যে পরীক্ষা দিতে বসে কি লজ্জা! হাসিখুসী, সুসজ্জিতা মেয়েদের দলে সে যে কতটা বেমানান, সেটা সে সেদিন উপলব্ধি করতে পারল। তার পাড়শূন্য কাপড়, গহনাশূন্য মণিবন্ধের প্রতি সচকিত দৃষ্টিপাত করে সবাই সরে গেল।

এর মধ্যে আবার অঙ্কের পরীক্ষার দিন ভাগ্যক্রমে একাদশী পড়ল। তখন পর্য্যন্ত নির্জলা একাদশী করত মৃণালিনী। সম্প্রতি কাজ করার অজুহাতে একবাটি মিছরি বা চিনির জল তার বরাদ্দ হয়েছে।

সেই অঙ্কের পরীক্ষার দিন তার জীবনের গতি যেন প্রথম মোড় ফিরল। তাই সেদিন স্মরণীয়। টিফিনের সময় পরীক্ষার পরে আকণ্ঠ-পিপাসায় শুষ্কমুখে প্রশ্নপত্র আর কলম হাতে নিয়ে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মৃণালিনী। অন্যদিন সে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে বই খাতা নিয়ে বসে। আজ চারিপাশেই পরীক্ষার্থিনীদের জন্য সুশীতল পানীয়, শুধু তারি জন্য তীব্র-পিপাসা! কচি তালশাঁস এক ফেরিওলা বিক্রী করছে; ডুরে শাড়ীপরা মেয়েটি ঘোলের সরবতের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। ডান পাশে একদল মেয়ে আইসক্রীম খাচ্ছে। সরে

যেতে পারল না মৃণালিনী, একদৃষ্টে চেয়ে রইল। মনে হ'ল তার চেয়ে থাকলেও পিপাসার লাঘব হ'বে বোধহয়।

কতকগুলি মেয়ে প্রশ্ন নিয়ে জল্পনা করছিল,—"যাই বলিস্ ভাই, এটা কেউ কষতে পারেনি। কি ভাবে যে অঙ্কটা কষতে হবে!"

মৃণালিনী অঙ্কটা দেখতে পেল। ভাইপোদের মাষ্টারমশাই একদিন এই অঙ্কটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সে জানে এ অঙ্ক তার ঠিক হয়েছে। বলবে সে ওদের কি করে কষতে হয় অঙ্কটা? কাজ নেই, অস্পৃশ্য বিধবা সে। লোকের মধ্যে এগিয়ে কিছু বলা তার সাজে না।

কিন্তু এত মেয়ের মধ্যে একমাত্র সেই অঙ্কটা ঠিক করতে পেরেছে। কেন সে এগিয়ে যাবে না, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবে না? সহসা সাহস করে মৃণালিনী এগিয়ে গেল,—"এটা এইভাবে কষতে হবে—"

সকলে বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাল, দ্বিধা-সন্দেহের দৃষ্টি। পরক্ষণেই মেয়েরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল,—"দেখি, দেখি!"

ধূলিধূসর রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সেদিন জীবনে প্রথম উপলব্ধি করল মৃণালিনী, সে একা নয়। যখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হবে সে, তখনি তার চারপাশে দেখা যাবে অগণ্য বান্ধব।

আসন্ন-পরীক্ষার ঘণ্টা পড়ল। আর পাঁচমিনিট আছে।

মেয়েরা তাকে অভিনন্দন করে ডাক দিয়ে হলে বসতে চলে গেল। কিন্তু এই আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সে লিখবে কেমন করে? তার জন্য তো কেউ পিপাসার শান্তি বরফ-শীতল পানীয় আনেনি। কিন্তু জল তো আছে, কলের সাদা জল। ঈশ্বরের দান জল সকলের জন্যই—সে জল তারও জন্য আছে। সে জল থেকে সে আর নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে না।

আপাদমস্তক সর্ব্বশরীরে একটা স্রোত বয়ে গেল মৃণালিনীর। সবল পদক্ষেপে সে উঠানের কলের নীচে অঞ্জলি পেতে জল গ্রহণ করল, পান করল। মানুষ হয়ে জন্মেছে সে, মানুষের অধিকার গ্রহণ করল মিথ্যা সংস্কারের গণ্ডী ভেঙ্গে। তাই সেদিন স্মরণীয়।

উনুনে আগুন ধরেছে। রাঁধুনী ওঠেনি। কেনই বা উঠবে? চা তৈরীর ভার বড়দিদি মৃণালিনীর ওপরে। সকাল থেকে কাজের চাপে স্কুলে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত নিশ্বাস নিতে পারে না সে। কিন্তু আজ কাজ তার খেলা। সমস্ত কাজের পেছনে হেমচন্দ্র আছে। সেই লক্ষ্যস্থলে আজ মৃণালিনী পৌঁছে যাবে। প্রেমের নিরাপদ আশ্রয়ে আজ তার পথহারা তরী কূল পাবে। তার মূল্যহীন জীবন অমূল্য হয়ে উঠেছে হেমচন্দ্রের ভালবাসায়।

হেমচন্দ্র! তার হেমচন্দ্র! এতদিন শুধু মৃণালিনীর স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিল—হ'ল তার প্রেমিক—আজ হবে স্বামী। হেম-

চন্দ্রের বাড়ীতে চলে যাবে আজ মৃণালিনী। আয়োজন প্রস্তুত আছে, আইনমতে তাদের বিয়ে হবে। একমাত্র পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে হেমচন্দ্রের স্নেহদুর্ব্বলা মাতা অবশেষে মত দিতে বাধ্য হয়েছেন।

কি কষ্টে যে মাষ্টারী করবার অনুমতি পেয়েছিল মৃণালিনী! বড়বউদির দাদা হেমচন্দ্র, তাদের পাড়ায় একটা মেয়েদের স্কুল খুলেছিল উচ্চ আদর্শ নিয়ে। পড়াবার ভাল লোক পাওয়া যাচ্ছিল না! নিরুপায় হেমচন্দ্র বোনকে ধরল,—"তোমার ননদ না ভালভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে বসে আছেন? ওঁকে দাও না ঠিক করে।"

বোন শিউরে উঠল,—"কি যে বলছ দাদা? শ্বশুরমশাই কখনও মত দেবেন না।"

"ওঁর নিজের কি মত?" হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করল।

"জানি না ঠিক। ওর মত থাকতে পারে। সারাদিন একা-একা কাটায়। একটা ছেলেপিলেও নেই। এই বয়েসেই নিজের মাথা খেয়েছে—"

"কেন, বেশ তো মাথা আস্ত আছে ওঁর! আমার কাছে ডেকে আন, আমি বলছি।"

ভয়ে ভয়ে গোপনে সেদিন বড়বউদি বয়স্থা ননদকে বয়স্থ দাদার সামনে বার করেছিল বলে-কয়ে। এর আগে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। সেই প্রথম হ'ল, দুই বছর আগে। হেমচন্দ্রের

দিকে কোনদিন আড়াল থেকে চেয়েও দেখেনি মৃণালিনী। পর-পুরুষের দিকে চাওয়া বিধবার পাপ বলে ধারণা ছিল তার। সেদিন চেয়ে দেখল উজ্জ্বল শুকতারার মত প্রদীপ্ত দুইটি চোখ, প্রতিভায় ভাস্বর ললাট। সবল পুরুষ, যে প্রেম দিয়ে নারীকে আশ্রয় দিতে জানে।

সেদিনে হেমচন্দ্রের বলা-কথা আজও কানে বাজছে মৃণালিনীর —"আপনি যে মরে যাচ্ছেন কাজের জন্যে। আপনার কি নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই? অন্যে যা ভাল বলবে, নির্ব্বিচারে সেইটে সারাজীবন মেনে যাবেন? কেন কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন? আপনি তো কোন দোষ করেননি।"

আজ কানে বাজছে হেমচন্দ্রের অনেক কথা, প্রতিমুহূর্ত্তে মনে তারা সাহস আনছে,—"জগতে অনেক জায়গা, মৃণালিনী। নিজের জায়গা খুঁজে নিতে হয়।"

বড়বৌদির শিশুপুত্র কলরব করে ছড়া বলে উঠল, "আতা গাছে তোতাপাখী, ডালিমগাছে মৌ—"

বড়দার ঘরের দিকে পা বাড়াতে যেয়ে মৃণালিনী ফিরে এল। আজ তিনদিন বাড়ীর কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। তিনদিন আগে সে বলে দিয়েছে হেমচন্দ্রকে সে বিয়ে করবে। আজ যে বিয়ে একথাও সবাই জেনেছে। তাই তাকে দেখেই যে যার শয়নমন্দিরে পুনঃপ্রবেশ করছে।

সুটকেশে অত্যাবশ্য-প্রয়োজনীয় কয়েকটা সামান্য জিনিষ তোলা

আছে। সেটি হাতে নিয়ে, রাত্রের অন্ধকারে নয়, দিনের প্রখর আলোয় এখনই প্রকাশ্যে সে চলে যাবে হেমচন্দ্রের গৃহে, হেমচন্দ্রের মাতার পুত্রবধূরূপে। কোন অন্যায় কাজ সে করছে না। যাকে মনে মনে স্বামী বলেছে, বাহিরে তাকে সেইভাবে গ্রহণ করায় যদি বাধা আসে সে বাধা মৃণালিনীকে বাঁধতে পারবে না।

তাদের বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছে নাম-না-জানা পাখী আবার ডেকে উঠল। যেন মৃণালিনীকে ডাকছে সে। তারই সঙ্গে সারা জগৎ তাকে ডাকছে, হেমচন্দ্রের প্রেম তাকে ডাকছে—

মৃণালিনী! মৃণালিনী! মৃণালিনী!

"আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কণ্টকসহ মৃণালিনী জলে।"

মৃণালিনী আজ পথে।

বিবাহ হয়েছে, লৌকিক অনুষ্ঠানের ত্রুটী হয়নি, শ্বাশুড়ী গ্রহণ করেছেন। তবু জীবনের জটিলতার শেষ হ'ল না। অনাত্মীয় প্রতিবেশীর কৃপামিশ্রিত কৌতূহলী কটাক্ষ, আত্মীয়বৃন্দের বিদ্রূপমিশ্রিত শোকপ্রকাশ কিছুরই অভাব নেই। গাড়ী ভাড়া করে জ্ঞাতিসম্পর্কে মাসীপিসীর দল মৃণালিনীর মায়ের দুর্ভাগ্যে শোকপ্রকাশ করতে আসেন। সে শোকপ্রকাশের ভাষা অথবা প্রণালী সঠিক না শুনতে হলেও অত্যাশ্চর্য্য দর্শনীয় বস্তুর মত তাঁদের সামনে মৃণালিনীকে দর্শন

দিতে হয়। দুই একজন হয়তো বলেন, “দেখতে শুনতে তো খুবই ভাল, কিন্তু—” সেই ‘কিন্তুর’ গুরুত্বই মৃণালিনীর জীবনকে দুর্ব্বিসহ করে তোলে। কেউ বা ঈর্ষিত হয়ে পড়েন। হেমচন্দ্রের মাতৃভক্তি আদর্শ ছিল, আজ হেমচন্দ্রের মায়ের কপাল ভেঙেছে। দশজনের অপদার্থ ছেলেদের মধ্যে হেমচন্দ্রই আদর্শস্বরূপ ছিল। আজ সেই হেমচন্দ্র নেমে এল দশের সঙ্গে অপযশের ধুলোকাদার মধ্যে। স্বজনের এ-আনন্দ রাখবার জায়গা কোথায়? কিন্তু, কেন এই বিধবা শ্রীহীনা কুরূপা হ’ল না! তাহলেই তো ষোলকলা পূর্ণ হ’ত। কেন এই বিধবার মুখে-চোখে ঊষার জ্যোতি, এর দৃষ্টি বুদ্ধিপ্রদীপ্ত! কেন এর দিকে তাকালেই আপনা থেকে মনে সম্ভ্রম উদয় হয়? নিজের চারিপাশে মহিমা ও লাবণ্যের প্রাচীর দিয়ে যেন এ বিধবা সাধারণ পর্য্যায়ের বাইরে চলে গেছে! নির্ব্বাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তাঁরা। সাধারণ গাম্ভীর্য্যে মৃণালিনী ধীরে ধীরে চলে আসে। তারপরে আরম্ভ হয় জনমতের বিষজিহ্বার বিষবৃষ্টি।

এতে দুঃখ ছিলনা মৃণালিনীর। কারণ, প্রথমে অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে সে জানত; সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। কিন্তু জনমতের কেবলমাত্র বিষজিহ্বা সক্রিয় হয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বিষদন্তও তার কাজ করছে অলক্ষিতে। যে শ্বাশুড়ী উদার-আগ্রহে গৃহে স্থান দিয়েছিলেন, যে-জননী সন্তানের

সন্তানের মুখ চেয়ে আজন্মপোষিত সংস্কার পদদলিত করতে দ্বিধা করেন নি, সেই ব্যক্তির আচরণে মধ্যে-মধ্যে অসহিষ্ণু ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছে। আশ্চর্য্য কি ? অবিরাম বাক্যবাণ তাঁর উদ্দেশে বর্ষিত হচ্ছে, প্রতিমূহূর্ত্তে সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। সকলে তাঁকে বুঝিয়ে যাচ্ছে, মৃণালিনী অস্পৃশ্যা। বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝেছেন, জগতে অন্য দশটা বস্তুর মত বিধবা-বিবাহ স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। হেমচন্দ্রের পরিতৃপ্ত প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে বুঝেছেন, হেমচন্দ্রের সুখের চাবিকাঠি মৃণালিনীর হাতে। মৃণালিনীর লাবণ্যশ্রী প্রতিদিন বসন্তসমাগমে কিশলয় দলের মত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। দেখে মা বুঝেছেন এ মেয়ের কোন অকল্যাণ নেই। তবু, দুর্ব্বল, স্নেহ-প্রবণ চিত্ত বিরুদ্ধ কথার আঘাতে সাময়িকভাবে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আঘাত লাগে মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের প্রাত্যহিক দিন যাত্রায়।

মা বিরক্ত হয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বন্ধ করেন, মৃণালিনীর জন্য বিবাহিতা কন্যার মুখ সন্দর্শনে বঞ্চিত হয়ে ভাগ্যকে দোষ দেন। মৃণালিনীর বৌদিকে পিতৃগৃহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। মাতার অসন্তোষ হেমচন্দ্রের মনকে স্পর্শ করে, বিমনা বিষণ্ণ হয়ে যায় সে। সেদিন এই নব-বিবাহিত দম্পতির জানালার বাহিরে মিলনরজনী বিফলে নিঃশ্বাস ফেলে চলে যায়। মৃণালিনীর সুখস্বর্গে রাহুর মত একটা কালো ছাপ যেন ছায়া ফেলে। মায়ের সঙ্গে ছেলের বন্ধন

এতই নিবিড় যে সামান্য আঘাতেই অশান্তির উদ্রেক ঘটে। স্বামীকে তো কেবলমাত্র প্রেমিক রূপেই প্রার্থনা করেনি মৃণালিনী, স্বামীর পরিবারের মধ্যেও আশ্রয় খুঁজেছিল।

রাস্তার পাশে একটি পার্ক, বৈশাখের অপরাহ্ন নিজের রৌদ্রদাহে স্তিমিত হয়ে অজস্র কৃষ্ণচূড়ার ঝরা দলে অন্তর্দাহের রক্তরেখা এঁকে দিয়েছে। পার্কের বেঞ্চে মৃণালিনী একটুক্ষণ বসল। ধীরে ধীরে আজকের ঘটনাবলী তার ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে উঠল। গৃহত্যাগ সে করল দ্বিতীয়বার। পিতৃগৃহ থেকে সে চলে এসেছিল হেমচন্দ্রের প্রেমের আহ্বানে নূতন করে ঘর বাঁধতে। আজ সেই ঘর ভেঙে আবার বেরিয়ে এল সে অনির্দ্দেশের সন্ধানে। সেই যাত্রায় মহত্ব ছিল, প্রেম ছিল পাথেয়। তাই মনে তার সেদিন ব্যথা বাজলেও উত্তাপ ছিলনা। আজ কোন শান্তি নেই। নূতন করে জীবন রচনা করতে যেয়ে সে ব্যর্থ হ'ল, তার সঙ্গে ব্যর্থ হ'ল হেমচন্দ্রের সর্ব্বত্যাগী প্রেম।

গতকাল হেমচন্দ্রের নিজের মাসীমা এসেছিলেন। দেবর-কন্যার সঙ্গে হেমচন্দ্রের বিবাহ দেওয়া তাঁর বহুদিনের বাসনা ছিল। সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'লনা, শ্বশুরালয়ে বোনপো তাঁর মুখ দেখাবার পথ রাখলনা বিধবা বিয়ে করে। সুতরাং সুদীর্ঘ দুই-ঘণ্টা তিনি ভগ্নীর মনকে বিষাক্ত করে গেলেন। মাসীমা অনা-চারের বাড়ীতে জলগ্রহণ করলেন না। চিররুগ্ন স্বামীকে এয়োতের জোরে এখনও ধরাধামে টিকিয়ে রেখেছেন তিনি!

সুতরাং তেজ কিছু বেশী। মাসীমা যাবার পরে মা মাথা ধরেছে বলে ঘরে কবাট দিলেন, রাত্রের স্বল্প জলযোগের আয়োজন পড়ে রইল।

তিনমাস বিবাহ হয়েছে মৃণালিনীর, কিন্তু শ্বাশুড়ীর স্বপাক অন্নে সে হাত দেয়নি। প্রয়োজন হয়নি। সে কুণ্ঠায়, দ্বিধায় দূর থেকে রান্নার যোগাড় করে দিত। আজ সকালে উঠে দেখল শ্বাশুড়ী তখনও ওঠেননি। ঝি আগুন দিয়ে উনুন ধরিয়ে দিয়েছে। মৃণালিনী তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে শ্বাশুড়ীর মাজা বোগনোতে খিচুড়ি চড়িয়ে দিল।

দরজা খুলে বাইরে এলেন শ্বাশুড়ী, কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লেন, "এ সবে হাত দিতে কে তোমাকে বলেছে?" সারামুখ তাঁর নিদ্রাহীনতা ও ক্রন্দনচিহ্নে মলিন।

অত্যন্ত ভীত ও কুণ্ঠিতভাবে মৃণালিনী বলল, "কাল খাওয়া হয়নি, তাই তাড়াতাড়ি একটু খিচুড়ি—"

জ্বলন্ত বোমার হিংস্রতায় শ্বাশুড়ী ফেটে পড়লেন,—"কে তোমাকে আমার রান্না চড়াতে বলেছিল? তোমার ছোঁয়া খাব আমি? অনেক সহ্য করেছি, এতটা পারবোনা। হয় বাড়ী থেকে তুমি যাও, নয় আমি। এত লাঞ্ছনা, এত কথা আমার শুনতে হ'বে না।"

সঙ্গে সঙ্গে মৃণালিনীর সযত্নর্নিম্মিত আহার্য্য কলতলার আবর্জ্জনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'ল। পিতল-কাঁসার ভারী ভারী

নিরামিষ রান্নার বাসনপত্র সেইসঙ্গে নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগল। সারা বাড়ী কেঁপে উঠতে লাগল সেই শব্দে।

হেমচন্দ্র পড়বার ঘরে বসে একখানা বই পড়ছিল, সসব্যস্তে ছুটে এল। একমুহূর্ত্ত সে স্থির হয়ে অগ্নিমূর্ত্তি মাতা এবং শঙ্কিতা পত্নীর দিকে তাকাল। পরমুহূর্ত্তেই অস্থির হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃণালিনীর জগৎ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল।

এই তার স্বামী! এই তাকে আশ্রয় দেবে! জগতের অত্যাচার থেকে যে তাকে বাঁচাবে, নিজের গৃহে সে কাপুরুষের মত পলাতক হ'ল! সুতরাং এ গৃহে মৃণালিনীর স্থান কোথায়?

সেদিন কারুর খাওয়া হ'লনা। হেমচন্দ্র ফিরল না। শ্বাশুড়ী গাড়ী ডাকিয়ে অহেতুক গঙ্গাস্নান করতে গেলেন। বেলা একটায় শূন্য বাড়ী থেকে মৃণালিনী বার হয়ে গেল। পুরাতন ঠাকুর চাকর বাধা দিতে সাহস পেল না।

অনেকপথ অন্যমনস্ক দ্রুততায় পার হ'ল মৃণালিনী। কোথায় যাবে? পিতৃগৃহের দ্বার চিরদিনের মত রুদ্ধ। কোন মেয়েদের বোর্ডিং-এ একটি কাজ খুঁজে নিতে হ'বে। এখন বড় ক্লান্ত সে, একটু বিশ্রাম চাই। পার্কের বেঞ্চে যতক্ষণ বসা যায় বসে থাকবে সে।

হঠাৎ দূরের শাদা বাড়ীটার দিকে চেয়ে চমকিত হ'ল মৃণালিনী। এইখানে না জীবনে প্রথম সে নিজেকে জগতে

প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করেছিল! আবার আজ অজানিতে এই পথেই চলে এসেছে সে! সেই পুরনো স্কুল-বাড়ী, সেখানে তার প্রবেশিকা পরীক্ষার আসন পড়েছিল। এইখানে হিন্দু মেয়ের অলঙ্ঘ্য সংস্কার বিচূর্ণ করে একাদশীর দিন সে জল পান করেছিল। এইখানে পরিক্ষার্থী মেয়েদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে সে নিজের কৃতিত্ব দেখাবার সাহস পেয়েছিল। সে সাহস আজ কোথায় গেল?

জীবনে পরাজিত হয়েছে মৃণালিনী। ঈশ্বর তাকে জগতে ব্যর্থ হ'বার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই অমোঘ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মাথা তুলে নিজের জীবন নিজের হাতে গঠন করবার ব্রতে সে পরাস্ত হয়েছে। আর, আজই কিনা এই পরাজয় সে উপলব্ধি করল তার জীবনের প্রথম অধিকার সাধনার জয়ক্ষেত্রে! কেন সে হেরে গেল? কি হ'ল? প্রেমের স্বপ্ন ভেঙে গেল তার তিনমাসের মধ্যে! ফাল্গুনের আকাশ বাতাস মৃণালিনীকে সুখের ইঙ্গিত পাঠিয়েছিল, বৈশাখের রৌদ্রদাহে সব জ্বলে গেল। সব গেল। কেন?

চকিতে কানের কাছে অচেতন মন যেন গুঞ্জরণ করে উঠল, —"ফাগুন দিনের মধুর খেলায় কোনখানে কোন ভুল ছিল ভুল ছিল"···সহসা বিদ্যুৎচমকে মৃণালিনীর মনের প্রান্তে চরম সত্য জেগে উঠল, ভুল হয়েছে তারই, হেমচন্দ্রের নয়। হেমচন্দ্রের প্রেম তাকে বাহিরে বিধবার বেশ খুলিয়েছে, কিন্তু

অন্তরে সে এখনও সেই রিক্ত, নিরাভরণ ম্লান-সজ্জা আঁকড়ে ধরে আছে! কুণ্ঠা-ভয়ে মলিন সে। প্রেমের দৃঢ়তা কেবল শাসনের গণ্ডী পার করায় না, অহরহ বিপক্ষ আবহাওয়ার সঙ্গে সংগ্রামের শক্তি যোগায়। হেমচন্দ্র তাকে আশ্রয় দিয়েছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠার ভার মৃণালিনীর ওপরে ছিল। দ্বিধা-সংশয়ে মলিন হয়ে যেত সে হেমচন্দ্রের বন্ধু-পরিজনদের সামনে। জোরের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তার সাহস ছিল কোথায়? হেমচন্দ্রের প্রেমকে সে-ই আশ্রয় দিতে পারেনি, কাপুরুষ সে নিজে।

মৃণালিনী! কেউ তাকে ডাকেনি তো। তবু এই সুর মৃণালিনীর হৃদয়-তন্ত্রীতে বাঁধা, ক্ষণে ক্ষণে আপনি বেজে ওঠে। মৃণালিনী উঠে পড়ল। হেমচন্দ্র তাকে ডাকছে, গৃহ তাকে ডাকছে। ভয় কি?

অনুতপ্তা শ্বাশুড়ীর নির্ব্বাক মূর্ত্তির সামনে মৃণালিনী দাঁড়াল নিজের তৈরী জলখাবারের রেকাব হাতে নিয়ে। সহজ আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, "মা, উঠুন খেয়ে নিন। আমি তৈরী করে এনেছি। আমার ছোঁয়া খেলে আপনার জাত যাবেনা। আমি আপনার পুত্রবধূ। আমার হাতে আপনার খেতেই হবে। না খেলে আমি ছাড়বনা, আমিও খাবনা কিছু। আপনি আমি না খেলে আপনার ছেলেও খাবে না!"

মায়ের চোখ দিয়ে কয়েকবিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল। এত-

দিনে মা আবার নিজেতে ফিরে এলেন। হাত বাড়িয়ে মৃণালিনীকে তিনি বক্ষে টেনে নিলেন। এতদিন তিনি মৃণালিনীকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর গৃহে, আজ স্থান দিলেন তাঁর অন্তরে।

দেড়বছর পরের কথা বলছি। সেই বাড়ী গৃহলক্ষ্মী মৃণালিনীর কল্যাণস্পর্শে নবরূপ ধারণ করেছে। শয়নকক্ষের দোলাতেও নবজাতক! পাশে মেঝের ওপর নিজহাতে বোনা শতরঞ্চে বসে মৃণালিনী স্কুলের কাগজপত্র দেখছে। হেমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত তাদের যোগসূত্র স্কুলটি অনেক বড় হয়েছে। এখন মৃণালিনী তার সেক্রেটারী। হেমচন্দ্রের সময় আরও কম।

মায়ের ঘরে মা ফর্দ্দ করছেন নাতির আসন্ন অন্নপ্রাশনের। মাসী আসেননি বটে, কিন্তু পিসী এসেছেন। আত্মীয়দের কতকাল দূরে সরিয়ে রাখা যায়? বিশেষতঃ 'মিনু' মেয়েটি ভাল, বিধবার কোন লক্ষণ নেই। অবশ্য বিধবার যে বিশেষ কি লক্ষণ থাকতে পারে সে বিষয়ে পিসীর ধারণা অস্পষ্ট।

জীবনের সার্থকতায় প্রদীপ্ত মুখ মৃণালিনীর। আজ প্রথম বড়বৌদি তার পিতৃগৃহে আসবে, এতদিনে মত দিয়েছেন পিতা। হেমচন্দ্রের মা নিজে নাতির কল্যাণকামনায় বৈবাহিককে আসতে ও কন্যাকে পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। পিতা বলেছিলেন, "আপনার দোষ কি? আমার মেয়েকে আমি হিন্দু-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে পারিনি। দোষ আমার। আমি

যেতে পারব না। আপনারা আপনাদের মেয়ে—আমার বউ-মাকে নিয়ে যেতে পারেন।” মৃণালিনী ঘরের মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে।

এখনি আসবে বড়বৌদি, হেমচন্দ্র আনতে গেছে। বড়বৌদির সঙ্গে, জানে মৃণালিনী, একতাড়া চিঠি আসবে সকলের কাছ থেকে। আরও দু' একদিন পরে বড়দা আসবে, তার সঙ্গে আসবে নবজাতকের জন্য উপহার আশীর্ব্বাদী দ্রব্য। তারপরে ধীরে ধীরে,—মৃণালিনীর অধরে প্রসন্ন, মৃদু-হাস্য দেখা দিল, জানে মৃণালিনী সবাই আসবেন, পিতা পর্য্যন্ত। ক্ষীণ যোগসূত্র বড়বৌদিকে তাঁরা আজ এ-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

জীবন অনেক দিয়েছে মৃণালিনীকে, সেও জীবনকে বঞ্চনা করেনি। অমর জীবনস্রোতের নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে বহন করছে আজ তার সন্তান। হয়তো তারই সন্তান-সন্ততি ভবিষ্যতে নূতন পৃথিবী, মহত্তর পৃথিবী, গড়ে তুলবে।

উঠে দাঁড়াল মৃণালিনী। নীচে বড়বৌদি এসে গেছে। যে-প্রেম গৃহসংস্কারের বাহিরে জগতের বিশাল পরিধিতে, যাকে অভিসারিকা রাধার উন্মাদনায় ডেকে এনেছিল, সেই প্রেম নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে তাকে কল্যাণী জননীরূপে আবার গৃহেই ফিরিয়ে নিতে আহ্বান করছে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে। হেমচন্দ্রের কণ্ঠে বেজে উঠেছে প্রেমের সেই চিরপরিচিত আহ্বান—মৃণালিনী! মৃণালিনী! মৃণালিনী।